বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডিএসই / DSE (বিশেষপত্র : ভাষাতত্ত্ব)-৩০২

ভাষাবিজ্ঞান : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ — প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

প্রতি পত্রের পূর্ণমান–৫০

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০২

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞান : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ : ১ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১ : বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

একক–২ : যুক্তব্যঞ্জন, দ্বিস্বর, অক্ষরগঠন ও বাংলা অক্ষরের গঠনরূপ

একক–৩ : বাংলা অবিভাজ্য স্বনিম (মাত্রা, শ্বাসাঘাত, সুরতরঙ্গ, যতি, নাসিক্যীভবন)

একক–৪ : বাংলা স্বনিম (স্বরস্বনিম, ব্যাঞ্জনস্বনিম, অনুনাসিক স্বরস্বনিম)

পর্যায় গ্রন্থ : ২ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৫ : রূপিম—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, নির্ণয়পদ্ধতি, নিদা'র পাঁচটি সূত্র

একক–৬ : বাংলা রূপমূলের মূলসূত্র—লিঙ্গ বচন

একক–৭ : কারক

একক–৮ : ক্রিয়ার কাল, পুরুষ

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–৯ : বাক্যতত্ত্ব—প্রথাগত ব্যাকরণের ধারা

একক–১০ : বাক্যের সংজ্ঞা ও গঠন, বিভিন্ন বাক্যের ধারণা, শুদ্ধ বাক্যের ত্রিসূত্র

একক–১১ : বাংলা পদক্রম

একক–১২ : অব্যবহিত ও চরম গঠনগত উপাদান

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ (সময় : ৪ ঘন্টা)

একক–১৩ : চমস্কি ব্যাকরণের ধারা

একক–১৪ : সংবর্ত ও সঞ্জননীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, বীজ বাক্য

একক–১৫ : চমস্কি পরবর্তী তত্ত্ব

একক–১৬ : বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন (বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ)

সূচিপত্র

তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই / DSE : ৩০২

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞান : পদ্ধতি ও প্রয়োগ

ডি এস ই : ৩০২	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি	১
	২	অধ্যাপক ড. দিলীপ নাহা	যুক্তব্যঞ্জন, দ্বিস্বর, অক্ষরগঠন ও বাংলা অক্ষরের গঠনরূপ	১৫
	৩	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা অবিভাজ্য স্বনিম (মাত্রা, শ্বাসাঘাত, সুরতরঙ্গ, যতি, নাসিক্যীভবন)	২৬
	৪	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	বাংলা স্বনিম (স্বরস্বনিম, ব্যাঞ্জনস্বনিম, অনুনাসিক স্বরস্বনিম)	৫০
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	রূপিম—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, নির্ণয়পদ্ধতি, নিদা'র পাঁচটি সূত্র	৬২
	৬	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাংলা রূপমূলের মূলসূত্র—লিঙ্গ, বচন	৭৫
	৭	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	কারক	৭৮
	৮	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	ক্রিয়ার কাল, পুরুষ	৮১
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাক্যতত্ত্ব—প্রথাগত ব্যাকরণের ধারা	৮৭
	১০	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাক্যের সংজ্ঞা ও গঠন, বিভিন্ন বাক্যের ধারণা, শুদ্ধ বক্যের ত্রিসূত্র	৯২
	১১	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	বাংলাপদক্রম	৯৬
	১২	অধ্যাপক ড. অরুণ ঘোষ	অব্যবহিত ও চরম গঠনগত উপাদান	১০১
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী	চমস্কি ব্যাকরণের ধারা	১০৭
	১৪	অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী	সংবর্ত ও সঞ্জননীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, বীজ বাক্য	১১৬
	১৫	অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস	চমস্কি পরবর্তী তত্ত্ব	১২৬
	১৬	অধ্যাপক ড. উদয় কুমার চক্রবর্তী	বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন (বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ)	১৩৭

ডিএসই/DSE : 302

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.১.১ : ধ্বনির স্বরূপ বিচার

৩০২.১.১.২ : বাগ্‌ধ্বনির উৎপত্তি

৩০২.১.১.৩ : বাগ্‌ধ্বনির স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

৩০২.১.১.৪ : বাংলা শব্দে ধ্বনির অবস্থান

৩০২.১.১.৫ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.১.৬ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর গঠন প্রকৃতি

৩০২.১.১.৭ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর প্রকারভেদ

৩০২.১.১.৮ : বাংলা সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর গঠন প্রকৃতি

৩০২.১.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.১.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.১.১.১ : ধ্বনির স্বরূপ বিচার

মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত ভাবপ্রকাশক ও অর্থবোধক ধ্বনির সমষ্টির নাম ভাষা। ধ্বনিই হল ভাষার প্রাথমিক উপাদান। তাই ভাষা বিশ্লেষণের কাজে ধ্বনির স্বরূপ-বিচার বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকলাপ থেকে শুরু করে উচ্চারিত ধ্বনির নানা বৈচিত্র্য স্বরূপ, উপাদান বিচার ও পরিবর্তনকে নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। এভাবে বিচার বিশ্লেষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র, রীতি ও দৃষ্টিকোণের তারতম্যে গড়ে উঠেছে ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিবিচার, ধ্বনিতত্ত্ব, উচ্চারণবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা শাখা। তেমনি ভাবে একালে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে ধ্বনি-সমাবেশ তত্ত্ব। এই শাখায় শব্দে ধ্বনির বিন্যাস ও তার সার্বিক রীতি-প্রকৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। প্রতিটি ভাষায় ধ্বনির বিন্যাস তথা ধ্বনির অবস্থান, সমাবেশ ও সংযোগের ক্ষেত্রে নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি থাকে। যে-কোন ভাষার স্বরূপ বুঝতে হলে সেই ভাষার ধ্বনি-বিন্যাসের এই স্বতন্ত্রতার পরিচয় নিতেই হবে। ভাষার ধ্বনি-সমাবেশের বিশেষত্বের মূলে যার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল অক্ষর বা দল। বাংলাভাষার বিভিন্ন ধ্বনির পারস্পরিক সংযোগ-সমাবেশের রীতি-প্রকৃতি ও অক্ষরের বৈশিষ্ট্য আমরা কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করছি।

কথায় বলে, ধ্বনিময় জগৎ। ধ্বনি শব্দের তাৎপর্য বহুমুখী। ভিন্ন জন ভিন্ন অর্থে ধ্বনিকে ব্যবহার করেন। যোগীর কাছে ধ্বনির অর্থ ব্রহ্মাণ্ডে উদ্ভূত ও পরিব্যাপ্ত বিশেষ নাদ। কাব্যতাত্ত্বিকের কাছে ধ্বনি হল কাব্যে ব্যাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঞ্জনা। এই দুই প্রকার ধ্বনিই সাধারণ মানুষের বস্তুবোধ-চেতনার বাইরে। পদার্থবিজ্ঞানী ধ্বনি বলতে বোঝেন বস্তুবিশ্বে সৃষ্ট যে-কোনো শব্দ (sound)। পাখির কলরব, মানুষের কথা, মেঘের গর্জন, গাড়ির হর্ণ, মেসিনের আওয়াজ, হাততালি, বাজি-পটকার শব্দ ইত্যাদি শত সহস্র শব্দ-সমারোহে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ পূর্ণ। এই শব্দ সমারোহের মাঝে ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে ধ্বনি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও এক সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য বহন করে। ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনি বলতে বোঝায় **'বাগ্‌ধ্বনি'** (Speech-sound) বা **'স্বন্'** অর্থাৎ মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে উচ্চারিত শব্দসমষ্টি। এই ধ্বনিই হল মৌখিক ভাষার মূল উপাদান। নানা ধ্বনির সমাবেশে ভাষার শরীর নির্মিত হয়। তাই ভাষার আলোচনায় ধ্বনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

৩০২.১.১.২ : বাগ্‌ধ্বনির উৎপত্তি

'বাগ্‌ধ্বনি'র উৎপত্তি হয় কী ভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় বাগ্‌ধ্বনির উৎপত্তি হয় মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে। ভাষাবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোন্‌সের ভাষায় বলা চলে, মানুষের ভাষা হল—'succession of sounds emitted by the organs of speech'। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন বাগ্‌ধ্বনি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'ফুসফুসের চাপে প্রেরিত নিঃশ্বাসবায়ু শ্বাসনালীদ্বয়ের (Trachea) মধ্য দিয়া কণ্ঠনালীতে (Larynx) মিলিত হয় এবং

তথা হইতে কণ্ঠ ও মুখবিবর অথবা কণ্ঠ ও নাসিকা পথে নির্গত হয়। যদি সচেষ্ট পেশিসঞ্চালনের দ্বারা এই নিঃশ্বাসবায়ু কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত স্থানমধ্যে কোথাও কোনোরকম বাধা পায়, তবেই তাহা ধ্বনি বা স্বন (Speech sound বা Phone) রূপে প্রকাশ পায়'।

৩০২.১.১.৩ : বাগ্‌ধ্বনির স্বরূপ ও বৈচিত্র্য

ধ্বনি-উপাদানের বহুবিচিত্র ফুলকে গেঁথে গেঁথে আমরা ভাষার মালাটি সাজাই। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র অসংখ্য ধ্বনি সৃষ্টি করতে সক্ষম। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই উচ্চারণের নানা পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও সব ধ্বনির ব্যবহার নেই এবং তা সম্ভবও নয়। ভাষার 'মূলধ্বনি' (ধ্বনিম বা স্বনিম বা ইংরেজিতে phoneme)-র পাশাপাশি 'ধ্বনিকল্প' ('সহধ্বনি', 'পূরক ধ্বনি' বা ইংরেজিতে 'free variation') ও 'মুক্ত-বৈচিত্র্য' ('ধ্বনিবিকল্প' বা ইংরেজিতে 'allophone')-এর সংখ্যা ধরেও বলা যায়, সব ভাষাতেই স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে উচ্চারিত ধ্বনির সংখ্যা মোটামুটি ভাবে সীমাবদ্ধ। কোনো ভাষার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য যেমন পাল্টায়, সেই সঙ্গে ধ্বনির সংখ্যাও পাল্টে যেতে পারে।

একইভাবে বলা যায়, কোনো বিশেষ ভাষার ধ্বনি-বিচারের ক্ষেত্রে বাগ্‌ব্যবহারকীর বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত সম্ভাব্য সকল ধ্বনির খতিয়ান তৈরি নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাষার ধ্বনি-নির্বাচন, ধ্বনি-ব্যবহার তার নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাষাবিজ্ঞানী David Crystal-এর ভাষায় বলা যায়—'The human vocal apparatus can produce a very wide range of sound, but only a small number of these are used in a language to construct all of its words and sentences'. ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্র এভাবেই আলাদা হয়ে যায়।—"Phonetics is the study of all possible speech sounds; Phonology studies the way in which a language's speakers systematically use a selection of these sounds in order to express meaning".

দেশ-কাল-ভাষাভেদে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে সৃষ্ট ধ্বনির মোট সংখ্যা নির্ণয় ও তার সম্পূর্ণ খতিয়ান তৈরি করা একপ্রকার দুঃসাধ্য কর্ম। উচ্চারণসাধ্য ধ্বনির তুলনায় যে কোনো ভাষার বাগ্‌ব্যবহারে ব্যবহৃত প্রকৃত ধ্বনির সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে।

ধরা যাক্, স্বরধ্বনির কথা। মানুষের উচ্চারণ-সাধ্য স্বরধ্বনির মোট সংখ্যা কত ? ভাষাবিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত মোট ২৫৪৯টি স্বরধ্বনিকে মুখগহ্বরে উচ্চারণস্থানসহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ যে-কোনো একটি ভাষার কথা যদি ধরা হয় তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় সেই ভাষায় উচ্চারিত মূল স্বরধ্বনির সংখ্যা ও বর্ণমালায় উল্লিখিত স্বরধ্বনির সংখ্যা খুব বেশি নয়।

ভাষাবিজ্ঞানীরা আটটি স্বরকে **'মৌলিক স্বর'** (cardinal vowel) রূপে চিহ্নিত করেছেন । বাংলায় মূল স্বরের সংখ্যা ৭। এস্কিমো ভাষায় স্বরের সংখ্যা মাত্র ৩। সবচেয়ে বেশি স্বরধ্বনি রয়েছে পঞ্জাবী ভাষায় মোট ২০টি। এ তো গেল স্বরধ্বনির কথা। তুলনায় ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা অনেক বেশি। সব ভাষাতেই স্বরধ্বনির তুলনায় ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা, বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রকমফের অনেক বেশি। বক্তার উচ্চারণ, শব্দে ধ্বনির অবস্থান, পার্শ্ববর্তী ধ্বনির প্রভাব প্রভৃতি নানাবিধ কারণে কোনো একটি বিশেষ ধ্বনি ঈষৎ ভিন্ন চেহারা নিতে পারে। কোনো ধ্বনির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাই শেষ কথা বলা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভবও বটে। ভাষাবিজ্ঞানী J.D.O Connor সাহেবের কথা স্মরণীয়—"Complete description is beyond our powers since it would mean mentioning an infinite number of feature".

ভাষার সংজ্ঞায় একথাও বলা হয়েছে, বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা উচ্চারিত যে-কোন ধ্বনিকে ভাষা বলা যাবে না—যদিনা সেগুলি অর্থবোধক ও ভাবপ্রকাশক হয়। ধ্বনির প্রধান লক্ষণ হল প্রতীকধর্মিতা। প্রতীকধর্মই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাবের বাহন বা অর্থবোধক করে। তাই ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন, ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে সৃষ্ট ধ্বনি-প্রতীকের (vocal symbol) সমষ্টি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, এক বা একাধিক ধ্বনির সমাবেশে গড়ে ওঠে অক্ষর, অক্ষর থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বাক্য। এবার আমরা দেখব শব্দে ধ্বনির অবস্থান-এর বিভিন্ন দিক।

৩০২.১.১.৪ : বাংলা শব্দে ধ্বনির অবস্থান

বাগ্‌ধ্বনির বৈজ্ঞানিক আলোচনায় শব্দে ধ্বনির অবস্থানের বিষয়কেও গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করতে হয়। অন্যধ্বনি-নিরপেক্ষ ভাবে ধ্বনির স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বিশেষত্ব বিচার যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন শব্দে ধ্বনিটির অবস্থান, পার্শ্ববর্তী অন্য ধ্বনির সঙ্গে সম্পর্ক ও প্রভাবের দিক খতিয়ে দেখা। নইলে কোনো ধ্বনির প্রকৃত স্বরূপ ঠিক ভাবে বোঝা যায় না।

কোনো মানুষের একক ব্যক্তি-স্বরূপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলেই যেমন তার সামগ্রিক পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না—সমাজ ও অন্যান্য পরিস্থিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ও অভিযোজনের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য নানাদিক ধরে বিশ্লেষণ করলে তবেই সম্পূর্ণ মানুষটিকে চেনা যায় ধ্বনির স্বরূপ বিশ্লেষণ তদনুরূপ। ড. রামেশ্বর শ-এর মন্তব্য অনস্বীকার্য—"ভাষার বিচারে বিচ্ছিন্ন ধ্বনির কোনো উপযোগিতা নেই, ধ্বনিগুলি পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্মিলিত হয়েই ভাষার সামগ্রিক রূপ রচনা করে। তাই কোনো ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় একক ধ্বনির বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করে তাদের তালিকা (inventory) প্রণয়নের যেমন উপযোগিতা আছে, তেমনি ধ্বনিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্কের (combination) রূপরীতি বিশ্লেষণেরও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বরং বলা হয়, এই একক ও সমষ্টিগত দুটি দিকই ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের পরস্পর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক অঙ্গ।" অর্থাৎ শব্দে ধ্বনির অবস্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অন্যধ্বনির সঙ্গে তার সংযোগ বিধির আলোচনা।

ভাষায় ধ্বনির সংযোগের নিয়মনীতি অত্যন্ত জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষাই উচ্চারণরীতি ও ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এক ভাষার সূত্র দিয়ে অন্য ভাষার বিচার সম্ভব হয় না। ড. রামেশ্বর শ-এর বক্তব্য যথার্থ—"ধ্বনির অবস্থানের ব্যাপারে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব নিয়ম আছে এবং এটা প্রত্যেক ভাষার স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন।" অবশ্য এমন কথা বলা যাবে না যে, কোনো ভাষার ক্ষেত্রে এই নিয়মনীতি অপরিবর্তনীয়। যে-কোন জীবন্ত ভাষা পারিপার্শ্বিক অন্য ভাষার অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে নিজেকে পাল্টাতেই পারে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলাভাষার ধ্বনির অবস্থানের নিজস্ব রীতিনীতি ও বিধিনিষেধ রয়েছে। বাংলা শব্দে ধ্বনির অবস্থান বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে আলোচনা করা যেতে পারে।

১। শব্দে ধ্বনির অবস্থানকে বিচার করা হয়ে থাকে তিন জায়গায়—আদিতে, মধ্যে ও অন্তে। তবে সব ধ্বনি সব অবস্থানে বসে না বা উচ্চারিত হয় না।

২। 'অ'-ধ্বনি শব্দের আদিতে ও মধ্যে বসে। শব্দের শেষে স্বরান্ত উচ্চারণে অ বজায় থাকলেও বর্ণ চিহ্ন থাকে না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় অবশ্য তা ছিল। কাশীরাম > কাশীরাম্। অ-ধ্বনির প্রায়শই ও-এর মতো সংবৃত উচ্চারণ হয়ে থাকে। অতি > ওতি, অপু > ওপু, অতুলপ্রসাদ > ওতুলপ্রসাদ, মত > মতো, বড় > বড়ো, অমুক > ওমুক ইত্যাদি।

৩। 'এ'-ধ্বনি শব্দের আদিতে অনেক সময় অ্যা-এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন—এক > অ্যাক। দেখে > দ্যাখে। শব্দের মধ্যে ও অন্তে ধ্বনিটি য়-শ্রুতি তৈরি করে। যাএ > যায়, খাএ > খায়, দু-এক > দুয়েক, চা-এর > চায়ের।

৪। 'অ্যা'-ধ্বনি সংস্কৃত বা বাংলা বর্ণমালায় নেই, অথচ বাংলায় এর ব্যবহার এত বেশি যে একে অন্যতম মূল স্বরধ্বনি রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্গাল উপভাষায় এ ধ্বনির প্রাচুর্য লক্ষ করার মত। মেঘ > ম্যাঘ, শেখ > শ্যাখ, শেষ > শ্যাষ, লেজ > ল্যাজ ইত্যাদি।

৫। 'ঙ'—নাসিক্য ধ্বনিটি শব্দের মধ্যে ও অন্তে বসে, কখনোই আদিতে বসে না। 'ঙ' বাংলায় উচ্চারণে 'ং'-এর সঙ্গে অভিন্ন। যেমন—বাংলা, বরং, রঙ, রং, সঙ, জাঙাল, সঙ্গ ইত্যাদি। 'ঙ'-দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হয় না।

৬। 'হ'—শব্দের আদিতে ও মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয়, অন্তে ব্যবহার কম। হত্যা, হজম, হোম, বহন, মহান। অন্তে কহ, লহ ইত্যাদির ব্যবহার রয়েছে বটে তবে কথ্য উচ্চারণে হ-এর শক্তি কমে আসে —কহ > কও, লহ > লও। তেমনি, বাহ্ হয়ে যায় বাঃ।

৭। 'ড়', 'ঢ়'—শব্দের আদিতে এদের দেখা পাওয়া যায় না—মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায়। তবে বাংলা উচ্চারণে ঢ়-এর মহাপ্রাণতা উধাও—বাড়ি, গাড়ি, তাড়া, আষাঢ় (আষাড়), রাঢ়ী (রাড়ি), মাঢ়ী (মাড়ি), মূঢ় (মূড়) ইত্যাদি।

৮। অন্তঃস্থ 'য়'-শব্দের আদিতে এর ব্যবহার নেই, শুধু মধ্যে ও অন্তে আছে। এ-ধ্বনি কীভাবে য়-শ্রুতি তৈরি করে আগে আমরা দেখিয়েছি। কোনো বিদেশি শব্দের আদি অবস্থানে য়-ধ্বনি থাকলেও বাংলায় তা ই হয়ে যায়। ফারসি য়ার > ইয়ার।

৯। অন্তঃস্থ 'ব'—তৎসম শব্দের মধ্যে ও অন্তে এর ব্যবহার প্রচুর। বাংলার উচ্চারণে শব্দের মধ্যে এর উচ্চারণ ওয়া। যেমন—খাওয়া, যাওয়া। শব্দের অন্তে ব্যবহার নেই। সমীভবনের প্রভাবের ফলে ধ্বনিটির পরিবর্তন ঘটে গেছে। যেমন—বিল্ব > বিল্ল, বিশ্ব > বিশ্‌শ। ফারসি শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ-র ব্যবহার রয়েছে। অনেক ফারসি শব্দ মূল উচ্চারণ অটুট রেখে বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বর্গীয় স্পর্শ-ধ্বনি-ব হয়ে গেছে। উকীল, বক্‌রি, ওয়ারিশ।

১০। অন্তঃস্থ 'য' এটি যদিও অর্ধস্বর, তবু শহেদর আদিতে, মধ্যে ও অন্তে অবস্থান করে এটি বাংলায় বর্গীয় জ-এর মত উচ্চারিত হয়। আর্য > আর্জ, যোগ > জোগ, যম > জম, যামিনী > জামিনী ইত্যাদি।

১১। জ্ঞ, ক্ষ, শ্ম, ষ্ম, ত্ম, হ্ন, হ্ল হল প্রভৃতি বহু যুক্ত বর্ণ সংস্কৃত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলায় এসেছে। শব্দের আদি, মধ্য ও অন্তে এদের অবস্থান সংস্কৃতের অনুরূপ। অবস্থান এদের বদলায়নি, কিন্তু উচ্চারণ পাল্টে গেছে। বাংলায় এরা হয়েছে জ্ঞ > গ্যঁ, গ্‌গ। যেমন জ্ঞান, অজ্ঞ (গ্যাঁন, অঁগ্‌গ) ক্ষ > খ, ক্‌খ। যেমন ক্ষয়, বক্ষ (খয়, বক্‌খ)। শ্ম > আদিতে ম। যেমন শ্মশান (শশান)। ত্ম > ত্ত। যেমন—আত্ম (আঁত্ত)। হ্ন > রি, হ্ল > র, হল > ল্ লহ্। যেমন—হৃদয়, হ্রদ, আহ্লাদ, হ্লাদিনী (রিদয়, রদ, আল্লাদ, লানিদী) ইত্যাদি।

৩০২.১.১.৫ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ধ্বনির পারস্পরিক সংযোগ ও সমাবেশকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা কঠিন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার কিছু নিজস্ব বিশেষত্ব রয়েছে। এই বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্রতা নির্ভর করে মূলত সিলেবল (syllable) বা উচ্চারণসাধ্য ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ, দল বা অক্ষরের গঠনের ওপর। ধ্বনিবিজ্ঞানে ও ধ্বনিতত্ত্বে সিলেবল (syllable) এক গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

প্রথমে বুঝে নিতে হবে সিলেবল (syllable), দল বা অক্ষর বলতে কী বোঝায়। মনে রাখা দরকার, ইংরেজিতে যাকে সিলেবল (syllable) বলা হয় বাংলায় তার অনেকগুলি পারিভাষিক নাম প্রচলিত আছে। যেমন, অক্ষর বা দল বা ধ্বনিগুচ্ছ।

কোনো শব্দকে ভাঙলে আমরা ক্ষুদ্রতম কণারূপে পাই এক-একটি ধ্বনি। ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে ভাষার ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-কণার নাম **'ধ্বনিম্'** (phoneme)। কিন্তু উচ্চারণযোগ্য ক্ষুদ্রতম ধ্বনি-কণার নাম সিলেবল

(syllable) বা দল বা অক্ষর। তা এক বা একাধিক 'ধ্বনিম্' (phoneme)-এর সমন্বয়ে তৈরি হতে পারে। বলা যায়, একটি ধ্বনি বা ধ্বনি-কণার সমন্বয়ে তৈরি হয় সিলেবল—যা নিশ্বাসের এক-এক প্রয়াসে উচ্চারিত ক্ষুদ্রতম একক।

ড. রামেশ্বর শ' অক্ষরের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"শ্বাসবায়ুর এক-এক ধাক্কায় আমরা যে ক-টি ধ্বনি একসঙ্গে উচ্চারণ করি সেই ক-টি ধ্বনি এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছ রূপে সংবদ্ধ হয়ে যায়, ছন্দোবিজ্ঞানে এই রকমের এক-একটি ধ্বনিগুচ্ছকে **অক্ষর** বা **দল** (syallble) বলা হয়"।

আমাদের বাগ্‌যন্ত্র একটানা সব ধ্বনিকে উচ্চারণ করতে পারে না। তাকে উচ্চারণসাধ্য ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগুচ্ছ বা অক্ষরে বিভাজন করে নিতে হয়। মানুষের বাগ্‌যন্ত্র থেকে উচ্চারিত ধ্বনিপ্রবাহকে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা জলস্রোতের তরঙ্গমালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্রোতের ধারা অখন্ড অবিভাজ্য, কিন্তু তার উত্থিত তরঙ্গ শীর্ষগুলি এক আপাত বিভাজনের আভাস আমাদের মনে তৈরি করে দেয়। বহু তরঙ্গের সংযোগ ও সমাবেশে যেমন জলধারা রচিত হয় তেমনি এক বা একাধিক সিলেবল (অক্ষর, দল, ধ্বনিগুচ্ছ)-এর সমাবেশ নিয়ে গড়ে ওঠে ভাষার ধ্বনিপ্রবাহ। শব্দের মধ্যে নিহিত ধ্বনিসমষ্টিকে একটানা উচ্চারণ করা যায় না, ছোট ছোট এককে ভাগ করে উচ্চারণ করতে হয়। সিলেবল হল সেই একক। শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায় এক বা একাধিক সিলেবল। উচ্চারণের এক-এক ধাক্কায় ন্যূনতম যতটুকু ধ্বনি তৈরি হওয়া সম্ভব, তাকে বলা হয়ে থাকে **সিলেবল**।

ধ্বনিবিজ্ঞানে ও ধ্বনিতত্ত্বে সিলেবল বা অক্ষরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। ভাষার ধ্বনি-সমাবেশ-তত্ত্ব দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভাষার সিলেবল বা অক্ষর গঠনের মূলনীতির ওপর। কোনো ভাষাতেই সিলেবল-কে চিহ্নিত করা খুব সহজ কাজ নয়। শব্দের উচ্চারণের তারতম্য ও ধরনের ওপর সিলেবল-এর সংখ্যার তারতম্য ঘটে থাকে। ভাষাতাত্ত্বিক David Crystal-এর ভাষায় বলা যায় "But it is by no means easy to define what syllable are or to identify them consistently". বাংলা ভাষায় অক্ষরের গঠন বিন্যাসের রীতিনীতি জানা তাই আবশ্যক। তিনি অনেক নমুনা দিয়ে সমস্যাটি বুঝিয়েছেন। যেমন, ইংরেজি five, meal, schism ইংরেজি শব্দগুলিতে ক-টা করে সিলেবল? এক না দুই? উচ্চারণের তারতম্যে এক-ও হতে পারে, আবার দুই-ও হতে পারে। **'meteor', 'neonate'**-এ ক-টা করে সিলেবল ? দুই না তিন ? উত্তরে বলা যায়— দুই-ও হতে পারে, আবার তিন-ও হতে পারে। **'doing'**-এর ক্ষেত্রে কী দাঁড়ায় ? হতে পাই দুটি সিলেবল। কিন্তু উচ্চারণের বেলায় এক সিলেবলের ঝোঁক — David Crystal-এর ভাষায় শব্দটি "usually spoken with a single muscular effort".

অক্ষরের গঠন-রীতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাবার আগে বর্ণ, অক্ষর ও ধ্বনির মধ্যে প্রভেদের দিকগুলিও জেনে নেওয়া প্রয়োজন—নইলে পারিভাষিক সমস্যা হতে পারে। ভাষার লিখন পদ্ধতির হরফ আমাদের এক একটি বাগ্‌ধ্বনি (speech-sound)-কে চিনিয়ে দেয়। হরফের অন্য নাম 'বর্ণ' (letter)—যা একান্তভাবে বাগ্‌ধ্বনির চিহ্ন বা প্রতীক। বর্ণ বা হরফ দৃষ্টিগ্রাহ্য, কিন্তু ধ্বনি শ্রুতিগ্রাহ্য। বর্ণ বা হরফকে

সচরাচর আমরা অক্ষর বলতেও অভ্যস্ত। এখানেই দেখা দেয় পারিভাষিক সমস্যা। **'নিরক্ষর', 'অক্ষরজ্ঞান', 'বাংলা অক্ষরমালা', 'ইংরেজি বড় হাতের অক্ষর', 'ছোট হাতের অক্ষর', 'সুন্দর হস্তাক্ষর'**—এই জাতীয় ভাষা-ব্যবহারে আমরা খুবই অভ্যস্ত। এখানে স্পষ্টতই অক্ষরকে **'বর্ণ'** (letter) অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু অক্ষরকে বর্ণ বা হরফের সঙ্গে এক করা মোটেই ঠিক নয়। এদের প্রকৃতি আলাদা।

কোনো শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য ছাপার হরফের বর্ণসংখ্যা দিয়ে কখনোই প্রকৃত ধ্বনি ও অক্ষরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির উচ্চরণই অক্ষর সংখ্যা জানার একমাত্র মাপকাঠি। ধ্বনিসংখ্যা, বর্ণসংখ্যা ও অক্ষরসংখ্যায় পরস্পর অমিল হবার সম্ভাবনাই বেশি।

কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক্, **'ও'** শব্দটি। এখানে বর্ণ একটি, ধ্বনি একটি, অক্ষর একটি। ফলে অসঙ্গতির সমস্যা নেই। কিন্তু **'ভাত', 'হাত', 'মাঠ', 'শীত', 'নট', 'পাপ', 'গীত'** ইত্যাদি শব্দের বাংলা উচ্চারণে ধ্বনি ও অক্ষরের অসঙ্গতির সমস্যা দেখা যায়। ওপরের প্রতিটি শব্দে বর্ণ ২টি, ধ্বনি ৩টি। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে অক্ষর মাত্র ১টি।

ধরা যাক্ **'বিবেকানন্দ'**। এই শব্দে ধ্বনির সংখ্যা ১১—ব্ + ই + ব্ + এ + ক + এ + আ + ন্ + অ + ন্ + দ্ + অ। কিন্তু এখানে উচ্চারণসাধ্য ধ্বনি বা সিলেবল-এর সংখ্যা মাত্র ৫ — বি + বে + কা + নন্ + দ।

'রবীন্দ্রনাথ'-এ ধ্বনির সংখ্যা ১২—র + অ + ব্ + ঈ + ন্ + দ্ + র্ + অ + ন্ + আ + থ্ + অ। উচ্চারণসাধ্য ধ্বনি বা সিলেবল-এর সংখ্যা ৫—র + বীন্ + দ্র + নাথ্।

উচ্চারণে দিক লক্ষ রেখে শব্দের ধ্বনিবিভাগ নির্ধারণ করতে হয়, লিখনরীতির দিকে তাকিয়ে নয়। আরও কয়েকটি নমুনা নীচে দেখানো হল—

দুর্দান্ত = দুর্ + দান্ + ত।

পান্ডিত্য = পান্ + ডিত্ + ত।

পূর্ণ = পূর্ + ণ

দুঃসাধ্য = দুস্ + সাধ্ + ধ।

সিদ্ধান্ত = সিদ্ + ধান্ + ত।

'দুর্দান্ত পান্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত' এই চরণে স্বর ও ব্যঞ্জন মিলিয়ে মোট ধ্বনির সংখ্যা ৩৬। কিন্তু সিলেবল বা অক্ষর-এর সংখ্যা মাত্র ১৪।

মনে রাখতে হবে, বর্ণ বা হরফ সবসময় সঠিক ভাবে উচ্চারণের পথনির্দেশ করতে পারে না। হরফের সংখ্যা নির্দিষ্ট। যে-কোন ভাষার ধ্বনির সংখ্যা ও উচ্চারণ-বৈচিত্র্য এত বেশি যে এই নির্দিষ্ট কিছু

হরফের মাধ্যমে সব ধ্বনিকে প্রকাশ করা অসম্ভব। আবার প্রতিটি ধ্বনির উচ্চারণেও রয়েছে নানা রকমের (variation)। উচ্চারণের ভিন্নতা বানানে ধরা পড়ে।

'অল্প', 'আলতা' ও **'উলটা'** শব্দ তিনটিতে **'ল'**-এর উচ্চারণ আলাদা। **'একতা'** ও **'একটা'**-র 'এক' এক নয়। **'কঞ্চি', 'ঠান্ডা', 'পান্তা', 'নানা'**—এই চারটি শব্দে **'ন'** ধ্বনি রয়েছে। প্রতিটি **'ন'** স্বতন্ত্র। প্রথমটিতে তালব্য ধ্বনি, দ্বিতীয়টিতে মূর্ধন্য ধ্বনি, তৃতীয়টিতে দন্ত্য ধ্বনি ও শেষটিতে দন্ত্যমূলীয় ধ্বনি। চোখে দেখে অবশ্য তা বোঝার উপায় নেই। কানে শুনে বোঝা যায়। পার্শ্ববর্তী অন্যধ্বনির প্রভাবের ফলে এমনটি ঘটেছে।

কাজেকাজেই, শুধু দৃষ্টিগ্রাহ্য হরফ দেখে শব্দের শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক চরিত্র বোঝা সম্ভব হয় না। পল্‌তা, নিমতা, **আমরা, তোমরা**—শব্দগুলির কথা ধরা যাক্। মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন **ল** ও **ম**-কে স্বরান্ত (ল্ + অ, ম্ + অ) ধরলে প্রতিটি শব্দে অক্ষর পাওয়া যায় **তিনটি**। বানান অপরিবর্তিত রেখে দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যদি আমরা এদের উচ্চারণ এইভাবে করি—**পল্‌তা, নিম্‌তা, আম্‌রা, তোম্‌রা**——তবে এরূপ হলন্ত উচ্চারণে প্রতিটি শব্দে অক্ষর সংখ্যা দাঁড়ায় **দুই**।

আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অনেক সময় ভিন্ন ব্যবহার ক্ষেত্রে একই শব্দের উচ্চারণ স্থির করতে হয় শব্দের অর্থ মিলিয়ে। এর ফলে উচ্চারণসাধ্য ধ্বনিবিভাগও আলাদা হয়ে যেতে পারে। একটি নমুনা দেখানো যেতে পারে।

১। অধরাতি ভর **কমল** বিকসিউ।

২। তোমার নাম **কমল**।

৩। শেয়ারের দাম **কমল**।

— তিন পৃথক বাক্যেই কমল শব্দটি বিদ্যমান। একই শব্দ—কিন্তু অর্থ ভিন্ন, উচ্চারণ ভিন্ন, শব্দের ধ্বনিবিভাগও তাই ভিন্ন। কেমন করে তা ঘটছে নীচে দেখানো হল—

প্রথম কমল ঃ ক্ + অ + ম্ + অ + ল্ + অ (ক, ম, ল)

দ্বিতীয় কমল ঃ ক্ + অ + ম্ + অ + ল্ (ক, মল্)

তৃতীয় কমল ঃ ক্ + অ + ম্ + ল্ + অ (কম্, ল)

৩০২.১.১.৬ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর গঠন প্রকৃতি

প্রত্যেক ভাষায় সিলেবল গঠনের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। সিলেবল (syllable)-এর গঠন প্রকৃতির ওপর ভাষার ধ্বনি-বিশেষত্ব অনেকখানি নির্ভর করে। স্বরধ্বনি (vowel) কে 'V' ও ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant) -কে 'C' ধরে সিলেবল বা অক্ষরের মূল গঠন-বিন্যাস দেখানো হয়ে থাকে।

সিলেবল-এ তিনটি অংশ থাকতে পারে। যথা—

১। অক্ষরারম্ভ (onset) **২। অক্ষরকেন্দ্র** (nucleus) **৩। অক্ষরান্ত** (coda)।

ধরা যাক্, **রাম** শব্দটি।

এতে আছে একটি সিলেবল বা অক্ষর। এর বিন্যাস CVC। এতে **র্** (C) অক্ষরারম্ভ (onset), **আ** (V) অক্ষরকেন্দ্র (nucleus), **ম্** (C) অক্ষরান্ত (Coda)। মনে রাখা দরকার অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) ছাড়া সিলেবল গঠন হতে পারে না। অন্য দুটি উপাদান-অংশ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। না থাকলেও ক্ষতি নেই, শুধু স্বরধ্বনি বা অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) নিয়েই তৈরি হতে পারে সিলেবল। যেমন—**'ও'**, **'এ'** ইত্যাদি। বাংলায়—**'ও'**, **'এ'** ধ্বনিগুলির বিশেষত্ব এই যে, এরা একই সঙ্গে ধ্বনিম (phoneme), সিলেবল (syllable) ও **শব্দ** (word)। **আম,** (VC)-এ রয়েছে অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) **'আ'** এবং অক্ষরান্ত (coda) **'ম'**। **মা** (CV) শব্দে রয়েছে অক্ষরারম্ভ (onset) ও অক্ষরকেন্দ্র (nucleus), অক্ষরান্ত (coda) নেই।

৩০২.১.১.৭ : সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর প্রকারভেদ

সিলেবল বা অক্ষর দুই প্রকার। **১। স্বরান্ত অক্ষর, মুক্ত দল** (open syllable)। ও

২। হলন্ত অক্ষর, রুদ্ধ দল (closed syllable)।

স্বরান্ত অক্ষর-এর আবার দুটি ভাগ—**১। মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর** ও **২। যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।**

দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, **'প্রাগৈতিহাসিক'** শব্দে সিলেবল বা অক্ষর সংখ্যা পাঁচ—**'প্রা'**, **'গৈ'**, **'তি'**, **'হা'**, **'সিক্'**। **'প্রা'**, **'গৈ'**, **'তি'**, **'হা'**—এরা স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্ত দল (open syllable)। **'সিক্'**—হলন্ত অক্ষর বা রুদ্ধ দল (closed syllable)। **'প্রা'**, **'তি'**, **'হা'**—মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর। **'গৈ'**—যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর।

মুক্ত দল ও রুদ্ধ দল-এর প্রভেদ এক কথায় এইভাবে বোঝানো যায়—যে অক্ষর বা দল-এ কোডা (coda) অর্থাৎ অক্ষরান্ত ব্যঞ্জন (C) রয়েছে তা হলন্ত **অক্ষর** বা **রুদ্ধ দল**। যেমন—**রাম্, শ্যাম্, বাপ্, শিব্, দীপ্, শব্** ইত্যাদি। যে অক্ষর বা দল-এ কোডা (coda) নেই তা **মুক্ত দল**। অর্থাৎ স্বরধ্বনি (V) বা অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) দিয়ে পরিসমাপ্ত হলে সেই দল হয় স্বরান্ত অক্ষর বা মুক্ত দল। যেমন—**মা, কি, চা, তা, কু, শ্রী, স্ত্রী।**

মন্ত্র—এখানে মোট দুটি দল রয়েছে। **মন্** রুদ্ধ দল, ত্র মুক্ত দল। **গীতা**—এখানেও রয়েছে মোট দুটি দল—**'গী'** ও **'তা'**। দুটি দলই মুক্ত।

৩০২.১.১.৮ : বাংলা সিলেবল (অক্ষর, দল)-এর গঠন প্রকৃতি

এবার আমরা বাংলা অক্ষর-গঠনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করব। স্বরধ্বনি (vowel) -কে 'V' ও ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant) কে 'C' ধরে বাংলা অক্ষরের মূল গঠনবিন্যাস দেখানো যেতে পারে এইভাবে—

V = এ, ও (একটিমাত্র স্বরধ্বনি নিয়ে অক্ষর গঠিত। ব্যঞ্জন নেই।)

VC = আট, আম, আজ, ইট, উট, ওল, ওম্, এক।

CV = মা, না, বা, সু, কি, খা, যা, দা, সে।

CCV = শ্রী, ত্রি

CCCV = স্ত্রী

CVC = রাম, মন, বন, পট, নট, মাঠ, ঘাট।

CCVC = প্রাণ, ত্রাণ, স্নান, ম্লান, ঘ্রাণ।

এইগুলিই হল বাংলা সিলেবল বা দল বা অক্ষর গঠনের মূলসূত্র। পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার সিলেবল (syllable) গঠনের নিজস্ব বিন্যাসকে এইভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ওপরে বাংলা অক্ষরের নিজস্ব গঠনবিন্যাস দেখানো হয়েছে। কিন্তু এর অতিরিক্ত আরও কিছু গঠন বৈচিত্র্য রয়েছে। সেগুলি দেখানো আবশ্যক। আমরা জানি, মধ্যযুগের শেষদিকে বাংলা শব্দভান্ডারে শত সহস্র বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ এই ভাষার প্রকাশগত শক্তি ও সৌন্দর্যকে শুধু অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করেছে তাই নয়, এই ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণবৈশিষ্টকেও নানা বৈচিত্রের দিকে চালিত করেছে। অক্ষরগঠনেও নতুন নতুন রীতিবৈচিত্র্য এনেছে। মধ্যযুগে ফারসি ও আধুনিক যুগে ইংরেজির উপাদান এত বেশি পরিমাণে ও এত গভীরে শিকড় ছড়িয়েছে যে এদেরকে ছাড়া একালের বাংলা ভাষা শুধু অচল নয়, অসম্পূর্ণও বটে। উচ্চারণেও বিদেশি প্রভাব পড়েছে অনিবার্যভাবে।

বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দ-উপাদানকে ভিত্তি করে আমরা অক্ষরের গঠনবিন্যাসে যে অতিরিক্ত নতুন রীতিগুলিকে পাই নীচে সেগুলি এই—

VCC = ইস্ট, আর্ট

CVCC = বেঞ্চ , বন্ধ্, সিল্ট সেন্ট, রেস্ট, বেস্ট, গেস্ট, মিন্ট, রেস্ত্, দোস্ত্, গোস্ত্

CCVCC = স্টান্ট, গ্রান্ট, স্মার্ট

CCCVCC = স্ট্রীক্ট, স্ক্রিপ্ট

ওপরের সূত্র ও দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টতই বাংলা ভাষার ফারসি ও ইংরেজি ভাষার প্রভাবের পরিমাণ ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। সব মিলিয়ে ওপরের সূত্রনিবদ্ধ দৃষ্টান্তগুলি থেকে বাংলা অক্ষর-গঠনের অপরিসীম বৈচিত্র্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বিদেশি উপাদানের ক্ষেত্রে অক্ষরান্তে দুটি ব্যঞ্জন যুক্তভাবে (CC—বিন্যাস লক্ষণীয়) বিদ্যমান—যা বাংলাভাষার নিজস্ব লক্ষণ নয়। আগে এই জাতীয় উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বা অক্ষরান্ত অংশে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উপস্থিতি বাংলা উচ্চারণে ছিল না। শব্দান্তে CC-র পরিবর্তে ধ্বনির উচ্চারণ হত CCV-রূপে। শেষে একটি স্বর এসে যেত। বলা বাহুল্য সেক্ষেত্রে ধ্বনিটি দুই অক্ষরে বিন্যস্ত হয়ে যেত—একাক্ষর থাকার উপায় ছিল না। যুক্তাক্ষরের প্রথম ধ্বনিটি চলে যায় আগের অক্ষরের অন্ত্যাংশ হয়ে, দ্বিতীয় ধ্বনিটি চলে যার পরের অক্ষরের আরম্ভ অংশ হয়ে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাংলায় অক্ষরান্তে অংশে একটির বেশি ব্যঞ্জন পাওয়া যায় না। স্বরান্ত উচ্চারণ বাংলার নিজস্ব বিশেষত্ব। ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দুর সঙ্গে বাংলার মূল স্বতন্ত্রতা ও পার্থক্য এখানে স্পষ্ট। ড. রামেশ্বর শ' যর্থাথই বলেছেন যে, "খাঁটি বাংলায় অক্ষরান্ত অংশে একের বেশি ব্যঞ্জন পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অক্ষরান্ত অংশে বাংলায় যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন পাওয়া যায় না। যেখানে অক্ষরান্ত অংশে সংযুক্ত ব্যঞ্জন আছে মনে হয় সেখানে আসলে তথাকথিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ধ্বনিটি একটি অক্ষরের অক্ষরান্ত এবং বাকি ধ্বনি বা ধ্বনিগুলি পরবর্তী অক্ষরের আরম্ভ অংশ।"

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

১। **স্তব্ধ, রুষ্ট, অব্দ, অক্ষ**---এই শব্দগুলির অন্তে ব্যঞ্জন যুক্তভাবে রয়েছে বলে এদের সংযুক্ত-ব্যঞ্জন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়। এদের সংস্কৃতানুগ উচ্চারণের মূল ধ্বনি-বিন্যাস হল—স্তব্ + ধ, রুষ্ + ট, অব্ + দ, অক্ + ষ। প্রতিটি শব্দে দুটি করে দল বা অক্ষর (Syllable)। বাংলায়ও আমরা এভাবেই দুই দলে ভেঙে উচ্চারণে অভ্যস্ত। ভাঙার প্রথম অংশটি প্রথম দলের অক্ষরান্ত (coda), শেষ অংশটি দ্বিতীয় দলের অক্ষরারম্ভ (onset)। **স্তব্ধ = স্তব্ + ধ** = এখানে **স্তব্** রুদ্ধ দল, **ধ** = মুক্ত দল।

হিন্দির সঙ্গে এখানেই উচ্চারণে বাংলার পার্থক্য স্পষ্ট। হিন্দিতে শব্দগুলি হলন্ত উচ্চারণে হয়ে যায়। এক-আক্ষরিক। যেমন—**স্তব্ধ্, রুষ্ট্, অব্দ্, অক্ষ্**।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দির এই উচ্চারণরীতির দ্বারা একালে বাংলাও অল্পস্বল্প প্রভাবিত হচ্ছে। এর সহজলভ্য নমুনা **'বন্ধ'** শব্দটি। এটি দুই অক্ষরের স্বরান্ত শব্দ (CVCCV)। এখন হরতাল বা স্ট্রাইক অর্থে বন্ধ আর স্বরান্ত উচ্চারিত হত না—হিন্দির প্রভাবে বাঙালির মুখে তা **বন্ধ্** হয়ে গেছে।

২। **রেস্ত্, ওয়াক্ত্, তখ্ত্, দর্দ্, ফর্দ্** প্রভৃতি বিদেশি শব্দ মূল উচ্চারণে অবশ্যই এক-আক্ষরিক। বাংলাভাষায় এসে এরা আমাদের নিজস্ব ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বরাগম কবলিত হয়ে পড়েছে। কখনও মধ্যস্বরাগম, কখনও অন্ত্যস্বরাগমের প্রভাবে হয়ে গেছে যথাক্রমে **রেস্ত, ওয়াক্ত, তখ্ত, দরদ, ফর্দ** ইত্যাদি। তবে মূল ফারসির (CVCC) হলন্ত-উচ্চারণও বাংলা বাগ্ব্যবহারকারীর মুখে যথেষ্ট পরিমাণে শোনা যায়।

৩। ইংরেজিতে অক্ষরান্ত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উদাহরণের অভাব নেই। বাংলাতেও মূল ধ্বনি অবিকৃত রেখে এদের ব্যবহার স্বীকৃত। CVCC, CCVCC ও CCCVCC সূত্রে তা দেখানো হয়েছে। এর অতিরিক্ত CCCVCCC, CCCVCCCC, CCCVCCCCC জাতীয় দীর্ঘ অক্ষরও ইংরাজিতে লভ্য। তবে বাংলা উচ্চারণে এরা তেমনভাবে সম্পৃক্ত নয়। বেঞ্চ , লিস্ট সেন্ট, রেস্ট, বেস্ট, মিন্ট, রিস্ক, লর্ড, শীল্ড, রেন্ট, গ্রান্ট স্মার্ট, স্টান্ট, স্প্রিন্ট, হান্ট, হার্ট, চার্ট, গার্ড, স্ট্রীক্ট ইত্যাদি অসংখ্য নমুনা উদ্ধার করা

যেতে পারে যে সকল আগন্তুক শব্দ-উপাদান ইংরেজি ভাষা থেকে এলেও এখন বাংলার শব্দভান্ডারের নিজস্ব সম্পদে পরিণত। এই শব্দসম্ভার শুধু বাংলা শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয় বাংলার ধ্বনিসংযোগ ও অক্ষর গঠনে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য এনেছে।

কাজেকাজেই, **বাংলা সিলেবল বা অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে** মনে রাখা দরকার :

১। স্বরধ্বনি ছাড়া অক্ষরগঠন সম্ভব নয়।

২। একটিমাত্র স্বরধ্বনি নিয়ে অক্ষর তৈরি হতে পারে।

৩। স্বরধ্বনিই কেন্দ্রীয় শক্তিরূপে অক্ষরকে ধরে থাকে। তাই স্বরধ্বনিকে বলা হয় অক্ষরকেন্দ্র (Syllable nucleus)।

৪। ব্যঞ্জনধ্বনি ছাড়াও অক্ষর গঠন সম্ভব। অক্ষরে এক বা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে যেমন পারে আবার একেবারে নাও থাকতে পারে।

৫। কোনো অক্ষরে স্বরধ্বনির অব্যবহিত আগের ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয় অক্ষরারম্ভ (onset), অব্যবহিত পরের ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় অক্ষরান্ত (coda)। অক্ষরারম্ভ (onset), অক্ষরান্ত (coda) ও অক্ষরকেন্দ্র (nucleus)-এর বৈচিত্র্যময় সমাবেশ-সন্নিবেশের মধ্যে দিয়ে কীভাবে অক্ষর গঠিত হতে পারে তা ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে আমরা দেখেছি।

অক্ষরারম্ভ (onset), বা অক্ষরান্ত (coda) ছাড়া কোনো অক্ষর গঠনে অসুবিধা নেই, কিন্তু অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) থাকা অত্যাবশ্যক। ওপরে প্রথম সূত্রে (V)তে তা দেখানো হয়েছে।

৬। VCC, CVCC, CCVCC ও CCCVCC—এই সূত্রের ধ্বনিবিন্যাস ইংরেজি ভাষার হলেও বাংলা অক্ষরগঠনের বর্তমান রীতির আলোচনায় এই সূত্রগুলিকে গ্রহণ করতেই হবে।

প্রসঙ্গত, বলা যায়, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য ও বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের ভাষার অক্ষরগঠনের মধ্যেও অপরিসীম বৈচিত্র্য। ওপরের আলোচনা থেকে ইংরেজি অক্ষরের কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। অক্ষরকেন্দ্র স্বরধ্বনিকে মাঝে রেখে বহু সংখ্যক ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে দীর্ঘ ইংরেজি অক্ষর গঠনের নমুনা সুপ্রচুর। স্লাভ্, ক্রোয়েশীয় ভাষায়ও দীর্ঘ ব্যঞ্জনগুচ্ছের নমুনা অনেক। জর্জিয়ার **কার্টেলিয়** (Kartvelian) ভাষায় ৪, ৫, ৬টি এমনকি ৮টি ধ্বনির গুচ্ছ সহজলভ্য। সর্বাধিক সংখ্যায় ১৩টি ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত অক্ষরের নমুনা পাওয়া যায় পশ্চিম কানাডীয় **সালিশ** (Salish)। ভাষাবংশের Nuxalk ভাষায়। অন্যদিকে অনেক ভাষায় উচ্চারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নেই একেবারেই। ব্রাজিলের আমাজান-তীরবর্তী **পিরাহা** ও নিউজিল্যান্ডের **মাউরি** ভাষায় পরপর দুটি ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নেই। জাপানী ভাষায় দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সংযুক্ত ব্যঞ্জন নেই। তাহিতি, **ফিজি**, হাওয়াই ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণের প্রবণতা কম। **আরবি** ভাষায় আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন নেই বা দুটি ব্যঞ্জনের অধিক সংযোগ শব্দের অন্য অবস্থানে নেই।

ওপরের ধারাবাহিক আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারছি এই বিষয়গুলি—

- ধ্বনির স্বরূপ কী
- বাগ্‌ধ্বনি কীভাবে তৈরি হয়

- বাগ্‌ধ্বনির স্বরূপ বৈচিত্র্য
- বাংলা শব্দে ধ্বনির অবস্থান কীভাবে ও কতভাবে হয়ে থাকে
- সিলেবল (অক্ষর, দল) কী
- সিলেবল-এর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
- বাংলা সিলেবল-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য
- বাংলা সিলেবল-এ বিদেশি উচ্চারণের প্রভাব

৩০২.১.১.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাগ্‌ধ্বনি কী? সাধারণ ধ্বনির সঙ্গে বাগ্‌ধ্বনির প্রভেদ কোথায়?

২। বাংলা শব্দে ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করো।

৩। সিলেবল কী? এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৪। সিলেবল-এর বাংলা পরিভাষাগুলি কী? সিলেবল অর্থে অক্ষর শব্দকে গ্রহণে বাধা কোথায়?

৫। অক্ষরারম্ভ (onset), অক্ষরান্ত (coda) ও অক্ষরকেন্দ্র (nucleus) কী বুঝিয়ে দাও।

৬। সিলেবল-এর প্রকারভেদ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৭। বাংলা সিলেবল-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা করো। বাংলা সিলেবল-এ বিদেশি প্রভাব কীভাবে পড়েছে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩০২.১.১.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ড. রামেশ্বর শ'—সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৪ ব.।

২। ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮।

৩। মোহম্মদ আবদুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, ১৯৮৮।

৫। David Crystal—The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University Press, 1987.

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ২

যুক্তব্যঞ্জন, দ্বিস্বর, অক্ষরগঠন ও বাংলা অক্ষরের গঠনরূপ

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.২.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

৩০২.১.২.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.২.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩০২.১.২.৪ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

৩০২.১.২.৫ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

৩০২.১.২.৬ : সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.২.৬.১ : সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

৩০২.১.২.৬.২ : বাংলা সংযুক্তব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.২.৭ : সংযুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

৩০২.১.২.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০২.১.২.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.১.২.১ : যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি একক ভাবে থাকতে পারে, আবার যুক্তভাবেও থাকতে পারে। একটি স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের যোগের ফলে যৌগিক স্বর-এর উদ্ভব ঘটে। এর সংজ্ঞা দেওয়া যায় এই ভাবে--- "নিঃশ্বাসবায়ুর ন্যুনতম প্রয়াসে অর্থাৎ শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় ('one breath impulse') যদি একাধিক স্বরধ্বনি যুক্তভাবে একটিমাত্র অক্ষর-এ নিবদ্ধ থেকে উচ্চারিত হয় তবে এই স্বরগুচ্ছকে বলা হয় যৌগিক স্বর"।

৩০২.১.২.২ : বাংলা যৌগিক স্বরের বৈশিষ্ট্য

উচ্চারণ-প্রক্রিয়া অনুযায়ী স্বর দু-প্রকার---একক **স্বর** ও **যৌগিক স্বর**। দেবনাগরী ও বাংলা অক্ষরমালায় স্বরধ্বনির তালিকায় একক স্বরধ্বনির সঙ্গে দুটি ব্যতিক্রমী ধ্বনি চিহ্ন পাওয়া যায়। এগুলি হল--**'ঐ', 'ঔ'**। এরা কিন্তু একক স্বরধ্বনি নয়। এই স্বরধ্বনি দুটিকে চিহ্নিত করা হয় যৌগিক স্বর রূপে। এদের মধ্যে যুক্তভাবে আছে দুটি করে একক স্বর। ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় : বাংলা উচ্চারণে ঐ = ওই, ঔ = ওউ।

বাংলা লিপির ক্ষেত্রে যৌগিক স্বরের বর্ণচিহ্নগুলি নিশ্চয়ই বাড়তি কিছু সুবিধা আমাদের দেয়। সই, বই, কই, মউ, বউ লেখার বদলে সৈ, বৈ, কৈ, মৌ, বৌ লিখে আমরা সংক্ষেপে কাজ সারতে পারি।

প্রচলিত অক্ষরমালায় দুটি মাত্র যৌগিক স্বরের উল্লেখ থেকে এমন মনে করার কারণ নেই যে সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরের তালিকা শুধু এই দুটি ধ্বনিতেই শেষ। রয়েছে আরো অনেক যৌগিক স্বর। স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্ন না থাকলেও এগুলির অস্তিত্ব সংশয়াতীত ভাবে বিদ্যমান।

এই, আই, ওই, আউ, এও, ইএ, ইআ ইত্যাদি বহু ধ্বনি সংস্কৃতে ও বাংলায় অপর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে, অথচ এগুলির জন্য—ঐ এবং ঔ-এর মতো কোনো পৃথক বর্ণচিহ্ন কল্পিত হয়নি।

৩০২.১.২.৩ : একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য কী?

সাধারণভাবে মনে হতে পারে, একক ও যৌগিক স্বরের মধ্যে পার্থক্য বোধহয় সংখ্যা বা পরিমাণগত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়। স্বরধ্বনির সংখ্যা নয়, স্বরধ্বনির বিশেষ গুণ (quality) বা উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই একক স্বর থেকে যৌগিক স্বর আলাদা হয়ে যায়।

সচরাচর দুটি স্বর যুগ্মভাবে যৌগিক স্বর গঠন করে বলে এর অন্য নাম দ্বিস্বর ধ্বনি (diphthong)। ভাষাতাত্ত্বিক David Crystal-এর ভাষায় Diphthong হল 'A vowel with a perceptible change of quality during a single syllable'. এখানে 'a perceptible change of quality' এবং 'single syllable' কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিস্বরধ্বনিতে বাহ্যত দুটি স্বরধ্বনি হাজির থাকলেও উচ্চারণের সময় দ্বিস্বরধ্বনি হয়ে ওঠে এক-আক্ষরিক ('single syllable')। নিয়মমত দুটি স্বর আলাদাভাবে দুই অক্ষর হওয়ার কথা। কিন্তু, উচ্চারণগুণে এরা এক-আক্ষরিক হয়ে উঠতে পারে। উচ্চারণ-প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, এরূপ ঘটনার পেছনে রয়েছে স্বরধ্বনির 'a perceptible change of quality'। আর এই স্বরের গুণগত বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে মুখগহ্বরে জিহ্বার অবস্থানের ওপর। একক স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা কোনো না কোনো সুনির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে। শুধু জিহ্বার অবস্থান নয়, ওষ্ঠাধর ও মুখবিবরের আকৃতিও যথানির্দিষ্ট। ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, ঊ ইত্যাদি স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় জিহ্বার অবস্থান সুনির্দিষ্ট। এক ধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বা অন্যস্থানে যায় না। কাজে কাজেই এরা একক স্বরধ্বনি। কিন্তু এমন যদি দেখা যায় যে কোনো ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা অতিদ্রুত এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানের দিকে সরে যায় এবং সমগ্র উচ্চারণ-প্রক্রিয়াটি নিঃশ্বাস বায়ুর এক ধাক্কার মধ্যে (অর্থাৎ এক অক্ষর বা সিলেবলের উচ্চারণকাল) নিষ্পন্ন হয়, তবে এই স্বরধ্বনিকে বলা হয় যৌগিক স্বর। ধরা যাক্, ঐ, ঔ শব্দ দুটি। ঐ (ওই) উচ্চারণের সময় জিহ্বা প্রথমে পশ্চাৎ (back) ও মধ্যউচ্চ (mid-high) অবস্থানে থেকে 'ও' উচ্চারণ করে, পরমুহূর্তেই দ্রুত সম্মুখ (front) ও উচ্চ (high) অবস্থানে এগিয়ে গিয়ে 'ই' উচ্চারণ করে। 'ঔ' (ওউ) উচ্চারণের সময় একই প্রক্রিয়ায় জিহ্বা প্রথমে 'ও' উচ্চারণ সেরে পশ্চাৎ (back) ও উচ্চ (high) অবস্থানে গিয়ে 'উ' উচ্চারণ সম্পন্ন করে। সাধারণত একক স্বর উচ্চারণের সময় জিহ্বাকে যতটুকু কালক্ষেপ করতে হয় এক্ষেত্রে ঐ সময়ের মধ্যে দুটো ধ্বনির উচ্চারণ শেষ করতে হয়। দ্রুততার কারণে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি কখনোই পূর্ণাঙ্গ হয় না--- তা অর্ধস্বরের মতো অর্ধোচ্চারিত থেকে যায়। পৃথকভাবে উচ্চারণকালে যে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ মুক্ত অক্ষর বা মুক্ত দল (open syllable), যৌগিক স্বরের মধ্যে অন্তিম অবস্থানে তা-ই বদ্ধ অক্ষর বা রুদ্ধ দল (closed syllable) হয়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিক মোহম্মদ আবদুল হাইয়ের ভাষায় বলা চলে---"দ্বৈতস্বর একাক্ষরিক (monosyllable) হওয়ার জন্যে তার প্রথম স্বরধ্বনিটি যেমন দীর্ঘ হয় তেমনি তার দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্রভাবে কিংবা শব্দের মধ্যে তার নিজস্ব রূপে উচ্চারিত হলে যেমন পূর্ণতা পায়, এখানে সেভাবে পূর্ণতালাভ করেনা। অন্য কথায় দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বরধ্বনি নয়"।

নমুনা হিসেবে শোও্, আয়্, যাই, ফাও্, ওই্, উই্ ইত্যাদি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর পরীক্ষা করলেই উক্তিটির তাৎপর্য বোঝা যাবে। শো + ও্, আ + য়্, যা + ই, ফা + ও্, ও + ই্, উ + ই্--এই দৃষ্টান্তগুলিতে যৌগিক স্বরধ্বনির অন্তর্গত দুটি স্বরের মধ্যে পরিমাণগত প্রভেদ বিদ্যমান। শো, আ্, যা, ফা্, ও, উ প্রভৃতি প্রথম স্বর পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়, কিন্তু ও্, য়্, ই, ও্, ই্, ই্ প্রভৃতি দ্বিতীয় স্বর অর্ধস্বরের মতো পিচ্ছিল ও অসম্পূর্ণভাবে উচ্চারিত হয়।

বলা হয়েছে, যৌগিক স্বর এক-আক্ষরিক (monosyllable)। তবে উচ্চারণের শিথিলতার কারণে কোনো কোনো যৌগিক স্বরধ্বনি দু-অক্ষরে সম্প্রাসিরত হতে পারে। উচ্চারণনির্ভর বলে এদেরকে জল-অচল নিয়মে বাঁধা যায় না। সেক্ষেত্রে এরা আর এক-অক্ষর থাকে না এবং তখন এদের আর যৌগিক স্বরও বলা যায় না। উচ্চারণরীতির তারতম্য সহজেই অক্ষর সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়। বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রীতির আলোকে **এই, ওই, আই, আউ, ইএ** প্রভৃতি যৌগিক স্বরধ্বনির উচ্চারণ বিশ্লেষণ করলে অক্ষর ও মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির বৈচিত্র্য বুঝতে সুবিধা হবে।

সেই, ওই, তাও---এই যৌগিক স্বরধ্বনিগুলিকে পরীক্ষা করা যাক্। একাক্ষরে সীমাবদ্ধ এই যৌগিক স্বরগুলি উচ্চারণের তারতম্যে হয়ে যায় দুই মাত্রা। যদি বলি,

"তোমার সঙ্গে **সে-ই** কবে দেখা!"

"নিষেধ করছি, **তা-ও** তুমি যাবে?"

"**ও-ই** এখানে এসেছে, অন্য কেউ নয়।"

এখানে উচ্চারণের সময় নিশ্চয় 'সে-ই', 'তা-ও', 'ও-ই' প্রভৃতি স্বরধ্বনি আর একাক্ষরে সীমাবদ্ধও থাকে না, অতএব এদের আর যৌগিক স্বরধ্বনি বলা সম্ভব নয়। অতএব, মনে রাখা আবশ্যক, দুটি স্বর পাশাপাশি অবস্থিত থেকেও যদি নিঃশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত না হয় তবে এই দুটি স্বরকে কোনোভাবেই যৌগিকস্বর বলার উপায় নেই।

৩০২.১.২.৪ : বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ

অধ্যাপক মোহম্মদ আবদুল হাই উপরোক্ত এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসে দ্রুত উচ্চারিত হয়ে সহজেই এক অক্ষরে আবদ্ধ থাকে যেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে তিনি বলেছেন নিয়মিত, আর উচ্চারণ-প্রসারণের কারণে যেসব দ্বিস্বরধ্বনি এক ঝোঁকে উচ্চারিত নাও হতে পারে সেসব দ্বিস্বরধ্বনিকে বলেছেন অনিয়মিত দ্বিস্বরধ্বনি। তিনি বাংলা যৌগিক স্বরের যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন তা এরূপ---

নিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি–

ইই (নিই, দিই)	ইউ (পিউ, শিউ)	এই (এই, সেই)	এও (ফেও)
এউ (ঘেউ)	এ্যাও (দ্যাও)	এ্যায় (ন্যায়)	আই (যাই)
আএ (যায়)	আও (যাও)	আউ (লাউ)	অএ (নয়)
অও (নও)	ওও (শোও)	ওউ (মউ)	ওই (ওই)
ওএ (শোয়)	উই (উই, রুই, পুঁই)		

অনিয়মিত দ্বিস্বর-ধ্বনি

ইএ (নিয়ে)	ইআ (মিয়া, নিয়া, সিয়া)	ইও (নিও)	এআ (কেয়া)
এও (খেও)	এ্যায়া (ন্যায়া)	অআ (নয়া)	ওআ (মোয়া)
ওএ (সয়ে)	উএ (নুয়ে)	উআ (চুয়া)	

৩০২.১.২.৫ : বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকা

দ্বিস্বরধ্বনির উপরোক্ত বিভাজন অবশ্যই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তাছাড়া, বাংলায় মোট যৌগিক স্বরের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভাষাতাত্ত্বিক মধ্যে মতভেদ যথেষ্ট। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫। তিনি নিয়মিত-অনিয়মিত ইত্যাদি বিভাজনের কথা ভাবেননি। কিন্তু, উচ্চারণের তারতম্যে প্রতিটি যৌগিক স্বরই যে পৃথকভাবে ভেঙে যেতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "দ্রুত উচ্চারণে, পূর্বোক্ত স্বরধ্বনিগুলি যৌগিক স্বরধ্বনি হইয়া যায়, আবার ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলে, দুইটি পৃথক স্বররূপেই প্রতিভাত হয়।" ড. মোহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ২৯। তাঁর সমীক্ষা অনুযায়ী নিয়মিত দ্বিস্বরের সংখ্যা ১৮, অনিয়মিত দ্বিসরের সংখ্যা ১১। ড. রামেশ্বর শ' সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকেই গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে যৌগিক স্বরের সংখ্যা ১৭।

নীচে উক্ত ভাষাবিজ্ঞানীদের প্রস্তুত বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির তালিকা দেওয়া হল—

মোহ. আব. হাই-কৃত	ড. সুনীতি চট্টো.-কৃত	ড. রামেশ্বর শ-কৃত	পবিত্র সরকার কৃত
ইই			ইই
ইউ	ইউ	ইউ	ইউ
এই	এই	এই	এই
এও	এও	এও	এও
এউ	এউ	এউ	এউ
এ্যাও	অ্যাও	অ্যাও	অ্যাও
এ্যায়	এয়, অ্যায়	অ্যাএ	অ্যাএ
আই	আই	আই	আই
আয়	আয়	আএ	আএ
আও	আও	আও	আও
আউ	আউ	আউ	আউ
অয়	অয়	অয়	অয়
অও	অও	অও	অও
ওও			ওও
ওউ	ওউ অউ, ঔ	ওউ, ঔ	ওউ, ঔ
ওই	ওই, ঐ	ওই	ওই
ওয়	ওয়	ওএ	ওএ
উই	উই	উই	উই

ইয়ে	ইয়ে, ইএ,	ইএ	
ইয়া	ইয়া	ইআ	
ইয়ো	ইয়ো	ইও	
এয়া	এয়া	এআ	
এ্যায়া			
অয়া			
ওয়া	ওয়া, ওআ	ওআ	
ওয়ে			
উয়ে	উয়ে	উএ	
উয়া	উয়া	উআ	
উয়ো	উয়ো, উও	উও	
	অআ	অআ	

দুটি ধ্বনির মিলনে যেমন 'দ্বিস্বর'-ধ্বনি, তেমনি তিনটি, চারটি বা পাঁচটি ধ্বনির যোগে তৈরি হয়ে থাকে যথাক্রমে 'ত্রিস্বর', 'চতুঃস্বর' ও 'পঞ্চস্বর' ধ্বনি। বাংলাভাষায় এই জাতীয় ধ্বনির সংখ্যা কম নয়। অবশ্য যুক্তভাবে থাকলেও এইগুলিকে যৌগিক স্বর বলা যাবে না, কারণ শ্বাসবায়ুর এক ধাক্কায় এরা উচ্চারিত হয় না বা এক অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধও থাকে না। নীচে বিভিন্ন স্বর-সমাবেশের বৈচিত্র্য দেখানো হল---

ত্রিস্বর - ইআও (মিঁয়াও) ইএই (নিয়েই) আইও (খাইও) এইএ (ধেইয়ে)
ওআও (নোয়াও) উইএ (শুইয়ে) এইও (হেইও) এআই (বেয়াই)
এআও (ধেয়াও) আওআ (হাওয়া) ইত্যাদি।

চতুঃস্বর -অওআই (হওয়াই) এওআই (দেওয়াই) আওআই (খাওয়াই) ইত্যাদি।

পঞ্চস্বর - আওআইও (খাওয়াইও)

৩০২.১.২.৬ : সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা ও গঠন বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.২.৬.১ : সংযুক্তব্যঞ্জনের সংজ্ঞা

আমরা স্বরধ্বনির যুক্ত-অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবার ব্যঞ্জনধ্বনির যুক্তভাবে উচ্চারণের প্রাসঙ্গিক দিক নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করা যেতে পারে।

দুটি বা তার বেশি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি নিঃশ্বাসের এক ধাক্কায় (one breath articulation) একাক্ষর নিবদ্ধ হয়ে যুক্তভাবে উচ্চারিত হয় তবে সেই ব্যঞ্জনধ্বনিকে বলা হয় 'সংযুক্ত ব্যঞ্জন' (Consonant cluster /Conjunct consonant)।

মোহম্মদ আবদুল হাই সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে---'বিভিন্ন স্থানজাত একাধিক ধ্বনি নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয়ে যদি একাত্মতা লাভ করে তা হলেই তা যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি বা consonant cluster নামে অভিহিত হবার যোগ্যতা অর্জন করে।

ড. রামেশ্বর শ' সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে চিহ্নিত করেছেন এইভাবে---কোনো ভাষায় অক্ষরের (syllable) প্রারম্ভে (onset) অথবা অন্তে (coda) অবস্থি যে ক-টি ব্যঞ্জন অক্ষরকেন্দ্রিক স্বরধ্বনির সঙ্গে এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় সে ক-টি ব্যঞ্জনকে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে।

৩০২.১.২.৬.২ : বাংলা সংযুক্তব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য

সংযুক্তব্যঞ্জন-এর গঠন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার আগে আমাদের 'যুক্ত-অক্ষর'-এর সঙ্গে এর প্রভেদ বুঝে নিতে হবে। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ছোটবেলা থেকে আমাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্ত ধারণা তৈরি করে দিয়েছে যে দুটি ব্যঞ্জন যুক্তভাবে থাকলেই তা যুক্তব্যঞ্জন। শিশু-পাঠ্যপুস্তকে ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন (র-ফলা, ল-ফলা, ম-ফলা ইত্যাদি) বা যুক্তাক্ষরের তালিকাও দেয়া থাকে। পাশাপাশি থাকা ব্যঞ্জন দুটির মাঝে কোনো স্বরধ্বনি নেই বলে এরা পরস্পর যুক্তভাবে রয়েছে—এটা বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয়না, কিন্তু বর্ণ-চিহ্নের এই যুক্তভাব উচ্চারণে রক্ষিত কিনা অর্থাৎ দৃশ্যমান হরফের সঙ্গে শ্রব্যমান ধ্বনির সামঞ্জন্য কতখানি রক্ষিত তা নিয়ে সাধারণ পাঠকের মাথাব্যাথা কম।

'যুক্তাক্ষর' ও 'যুক্তব্যঞ্জন' এক নয়। অথচ এই দুইকে একই অর্থে ব্যবহার করতে আমরা অভ্যস্ত। সংস্কৃত বর্ণমালার উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরা প্রচুর যুক্তাক্ষর-চিহ্নিত বর্ণ বাংলায় পেয়েছি। যুক্তাক্ষরপূর্ণ কয়েকটি পংক্তি বা চরণ উদ্ধার করা যাক—

১। মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ মধুপশব্দগঞ্জিগুঞ্জ

কুঞ্জরগতি গঞ্জিগমন মঞ্জুলকুলনারী।

২। নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

৩। সুরাঙ্গনা নন্দনের নিকুঞ্জ প্রাঙ্গনে।

মন্দার মঞ্জরি তোলে চঞ্চল কঙ্কনে।।

৪। অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন।

ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঙ্ক, ন্ত, র্গ, চ্ছ প্রভৃতি অক্ষরে অবশ্যই দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জন যুক্তভাবে রয়েছে। যেহেতু যুক্তভাবে আছে তাই এগুলি যুক্তাক্ষর। মনে রাখা জরুরি, এগুলি কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন নয়। যদিও এদেরকে অসতর্ক ভাবে যুক্তব্যঞ্জন নামে অভিহিত করতে অভ্যস্ত অনেকেই। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় যুক্তব্যঞ্জনের ভিন্ন তাৎপর্য নির্দেশিত হয়েছে। ধ্বনিবিশ্লেষণে সহজেই ধরা পড়বে যে বর্ণচিহ্নে যুক্তভাবে থাকলেও উচ্চারণে এরা যুক্তভাবে নেই। মঞ্জু-র উচ্চারণ হয়ে থাকে 'মন্ + জু' এই ভাবে। অনুরূপভাবে--নন্দ = নন্ + দ, চন্দ্র = চন্ + দ্র, বৃন্দা = বৃন্ + দা, অন্ধ = অন্ + ধ ইত্যাদি। ঞ্জ, ন্দ, ন্দ্র, ন্ধ, ঙ্গ, ঞ্চ, ঙ্ক, ন্ত, র্গ, চ্ছ—এই সংযুক্ত ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারণসাধ্যই নয়। পূর্বধ্বনির সহায়তা ছাড়া এদের উচ্চারণ অসম্ভব। আবার শব্দে নিবদ্ধ থাকলেও নিঃশ্বাসের এক ঝোঁকে এদের উচ্চারণ করা যায় না। কাজেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের বিশেষ লক্ষণ এদের মাঝে নেই। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মন্তব্য অনস্বীকার্য যে, "ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো।" অক্ষরের সংযুক্ততার দিক দিয়ে বিচার করে বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর-এর সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। অন্যদিকে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যা অতি নগণ্য।

স্পর্শধ্বনি, উষ্মধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি, কম্পিতধ্বনি ও পার্শ্বিকধ্বনির মধ্যে দুটি বা তিনটি ধ্বনির পরস্পর মিলনে বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন কীভাবে গঠিত হয়ে থাকে তা নীচে দেখানো হল---

১। স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = প্রাণ, ভ্রম, ঘ্রাণ, ঘৃত, ব্রীড়া।

২। স্পর্শধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি = ক্লেশ, প্লীহা, গ্লানি।

৩। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি = স্মরণ, স্নান।

৪। উষ্মধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্মৃতি।

৫। নাসিক্যধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = নৃত্য, মৃত, ম্রিয়মান।

৬। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি = স্কন্ধ, স্কুল, স্খলন, স্ফটিক, স্পর্শ, স্থল, স্তব।

৭। উষ্মধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি = শ্লীল, শ্লোক।

৮। উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = স্ত্রী, স্পৃহা, স্পৃষ্ট।

৯। নাসিক্যধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি = ম্লান।

১০। উষ্মধ্বনি + কম্পিতধ্বনি = শ্রী, শ্রুতি।

সংযুক্ত ব্যঞ্জনকে পরীক্ষা করতে হয় শব্দের আদি অবস্থানে। ওপরের দৃষ্টান্তগুলিতে তা দেখানো হয়েছে। শব্দের মধ্যে বা অন্তে উচ্চারণের ধ্বনিবিভাজন প্রকৃতি সংযুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙ্গে অক্ষরসংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। যেমন—ভ্রম, শ্লীল, ম্লান, শ্রী, প্রাণ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে আদিতে সংযুক্তব্যঞ্জন ভ্র, শ্ল, ম্ল, শ্র, প্র রক্ষিত), কিন্তু এরা যদি শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থান করে তবে ধ্বনিবিভাজনের কবলে পড়ে। তখন আর সংযুক্তব্যঞ্জন বিযুক্ত হয়ে যায়। যেমন—বিভ্রম, অভ্র, অশ্লীল, অম্লান, অম্ল, বিশ্রী, বিপ্র, আপ্রাণ উচ্চারণে দাঁড়ায় যথাক্রমে বিভ্ + রম, অভ্ + র, অশ্ + লীল, অম্ + লান, অম্ + ল, বিশ্ + রী, বিপ্ + র, আপ্ + রাণ।

নীচে বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকা দেওয়া হল---

স্ক্ (স্কন্ধ),	স্খ্ (স্খলন),	স্ত্ (স্তব),	স্থ্ (স্থল),	স্ন্ (স্নায়ু),
স্প্ (স্পর্শ),	স্ফ্ (স্ফটিক),	শ্র্ (শ্রম),	শ্ল্ (শ্লোক),	স্প্র্ (স্প্রৃহা),
স্ত্র (স্ত্রী),	প্র্ (প্রাণ),	ব্র্ (ব্রত),	ভ্র্ (ভ্রম),	ত্র্ (ত্রাণ),
দ্র্ (দ্রুত),	ধ্র্ (ধ্রুপদ),	ক্র্ (ক্রোধ),	গ্র্ (গ্রহ),	ঘ্র্ (ঘ্রাণ),
ম্র (মৃত),	ন্র, (নৃত্য),	প্ল্ (প্লীহা),	ক্ল্ (ক্লেশ),	গ্ল্ (গ্লানি),
ম্ল্ (ম্লান),	জ্র (জৃম্ভিত),	ড্র্ (ড্রাম),	খ্র্ (খ্রিস্টাব্দ),	ব্ল (ব্লাউজ),
স্ট্ (স্টেশন),	ফ্ল্ (ফ্ল্যাট),	ট্র্ (ট্রাম),	থ্র্ (থ্রেট),	স্ম (স্মার্ত),
ফ্র্ (ফ্রক),	হল্ (হ্লাদিনী),	হ্র (হ্রদ),		

বাংলায় গৃহীত বিদেশী শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলিও এই হিসেবে ধরা আছে। এরূপ আটটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন হল---**স্ট্, ফ্ল, ফ্র, ড্র, খ্র, ব্ল, ট্র, থ্র**।

হ্ল্ ও হ্ন---এই দুটি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের দেখা মেলে শুধু কিছু তৎসম শব্দের সংস্কৃতানুগ উচ্চারণে। যেমন---**হ্লাদিনী, হ্রদ, হৃদয়, হ্রাস, হৃত, হ্রেষা, হ্রীং** ইত্যাদি। ড. রামেশ্বর শ হল্ ও হ্র-কে যুক্তিযুক্ত ভাবেই বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকায় রেখেছেন। যদিও মুহম্মদ আবদুল হাই-এর তালিকায় এই ধ্বনিগুলি অনুপস্থিত।

মোহম্মদ আবদুল হাই ও ড. রামেশ্বর শ উভয়েই চ্ছ্র-কে তাদের তৈরি তালিকায় স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যঞ্জনটির বাগ্-ব্যবহারের সঠিক নমুনা আমরা পাইনা। 'কৃচ্ছ্র' বা 'উচ্ছ্রিয়া'---শব্দে **'চ্ছ্র'** কি আদৌ সংযুক্ত ব্যঞ্জন? উচ্চারণকালে আমরা শব্দগুলির ধ্বনিবিজ্ঞান করি এই ভাবে---**'কৃচ্ছ্ + র'**, **'উচ্ছ্ + রিয়া'**। শব্দের আদিতেও 'চ্ছ্র'-এর ব্যবহার একেবারেই নেই। সবদিক বিচার করে চ্ছ্র-কে বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকার বাইরে রাখাই সমীচীন।

স্ম্-ধ্বনিটি মোহম্মদ আবদুল হাই এবং ড. রামেশ্বর শ-এর প্রস্তুত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অথচ **'স্মৃতি'**, **'স্মার্ত'** প্রভৃতি শব্দ ধরলে 'স্ম্' ধ্বনির ব্যবহারে ও উচ্চারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সব লক্ষণই রয়েছে। একে আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছি।

শুধু যুক্তাক্ষরের সুনির্দিষ্ট বর্ণ-চিহ্নে যুক্তব্যঞ্জনের সমাবেশ থাকবে তা নয়, শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থানে এরা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তার উচ্চারণ হয়ে থাকে হলন্ত ব্যঞ্জনের ন্যায়। তার নিজস্ব স্বরধ্বনিটি অনুচ্চারিত থাকে। ব্যঞ্জনধ্বনির এ জাতীয় অসম্পূর্ণ উচ্চারণকে পাণিনি প্রমুখ পন্ডিতেরা বলেছেন 'অভিনিধান'। ধ্বনিবিদ্গণ লক্ষ করেছেন, এই জাতীয় ধ্বনির ক্ষেত্রে প্রথম স্পর্শধ্বনিটি উচ্চারণের দিক দিয়ে সামান্য প্রলম্বিত হয়। বাংলায় এই স্পর্শধ্বনিগুলি অবস্থান করে দুটি স্বরধ্বনির মাঝখানে।

৩০২.১.২.৭ : সংযুক্তব্যঞ্জন-এর সঙ্গে ব্যঞ্জন সমাবেশের পার্থক্য

আমরা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব ব্যঞ্জন-সমাবেশ বিষয়ে। সেই সঙ্গে জানা প্রয়োজন 'সংযুক্তব্যঞ্জন' ও 'ব্যঞ্জন-সমাবেশ'-এর মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়।

আমরা ড. রামেশ্বর শ-এর বিশ্লেষণ উল্লেখ করেছি—"একাধিক ব্যঞ্জনের মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি যদি না থাকে এবং সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় তবে তাদের ব্যঞ্জন সমাবেশ (consonant combination) বলতে পারি। যেমন—'অন্তর' শব্দের 'ন্ + ত্'। কিন্তু একাধিক ব্যঞ্জনের মধ্যে যদি স্বরধ্বনি না থাকে, সেই ব্যঞ্জনগুলি যদি নিকট সন্নিবিষ্ট হয় এবং নিশ্বাসের এক ধাক্কায় উচ্চারিত হয় তবে তাদের সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster) বলে। যেমন—'স্ত্রী শব্দের 'স্ + ত্ + র্'।"

পূর্বে উল্লিখিত বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যা সীমিত। খাঁটি বাংলাব্যঞ্জন ২৮টি। বাংলায় গৃহীত বিদেশি শব্দের ব্যঞ্জন রয়েছে আরও ৮টি। সবমিলিয়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সংখ্যা ৩৬। অন্যদিকে ব্যঞ্জন-সমাবেশের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো।

ব্যঞ্জন-সমাবেশ বলতে ড. রামেশ্বর শ-এর মন্তব্য স্মরণীয় যে, **"সব সংযুক্ত ব্যঞ্জনই ব্যঞ্জন-সমাবেশ, কিন্তু সব ব্যঞ্জন যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন নয়।"** ধ্বনিতাত্ত্বিকগণ বাংলাভাষার নানা ব্যবহারিক নমুনা পরীক্ষা করে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জন সমাবেশের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন। পরিবর্তনশীল বাগ্‌ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে। মধ্যযুগ থেকে বিদেশি আগন্তুক শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলার ধ্বনি ও উচ্চারণে বহুধা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে ফারসি, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজি থেকে আগত বহু সংখ্যক সংযুক্ত ব্যঞ্জন বাংলার নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভাষার অনিবার্য প্রভাব পড়ছে বাংলার ওপর। নিত্যনতুন শব্দ উপাদানে বাংলার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই অনুসারে নতুন নতুন ব্যঞ্জন-সমাবেশ ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনও আমাদের ভাষায় দেখা দিতে পারে।

বাংলা শব্দগঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে রয়েছে অপরিসীম বৈচিত্র্য। তার সামান্য কিছু রীতিপ্রকৃতি ও দৃষ্টান্ত নীচে দেখানো হল--

১।	স্পর্শধ্বনি+স্পর্শধ্বনি--	ক্ +ট (এক্টা),	ক্ +দ (তক্‌দির),	ক্ +চ (চক্‌চক)
		গ্ + দ (দিগ্‌দর্শন),	গ্ + ফ (ভাগ্‌ফল),	চ্ +ক (বোচ্‌কা)
		চ্ + ট (পাঁচ্‌টা),	ছ্ + প (পিছ্‌পা)	জ্ +খ (বাজ্‌খাই)
		জ্ + প (রাজ্‌পুত),	ট +ক (মট্‌কা)	ঠ +ত (উঠতি)
২।	স্পর্শধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ক্ + ম (তক্‌মা),	গ্ +ন (ভাগ্‌নে),	ছ্ +ন (জোছনা),
		জ্ + ম (এজমালি),	ট + ন (পাটনা),	ত্ + ন (পেত্‌নী)
		দ্ + ম (কদ্‌মা),	ব্ + ন (ভাবনা)	
৩।	স্পর্শধ্বনি + পার্শ্বিকধ্বনি--	ত্ + ল (তোত্‌লা),	ব্ +ল (বাব্‌লা),	প্ + ল (পাগ্‌লা)
৪।	স্পর্শধ্বনি + কম্পিতধ্বনি--	ক্ + র (ছোক্‌রা),	দ্ + র (দাদরা),	প্ + র (চাপরাশ)
৫।	স্পর্শধ্বনি + তাড়নজাত ধ্বনি--	ক্ + ড় (কাঁক্‌ড়া),	গ্ + ড় (ঝগ্‌ড়া),	প্ +ড় (পাপ্‌ড়ি)
৬।	স্পর্শধ্বনি + উষ্ম ধ্বনি--	গ্ + স (লাগ্‌সই),	ত্ + স (কুৎসা),	দ্ + শ (বাদ্‌শা)
৭।	উষ্মধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	শ + ক (মুশকিল),	শ্ + গ (মশ্‌গুল),	শ্ + ল (মশ্‌লা),
		ষ + ট (বোষ্টম)		
৮।	পার্শ্বিকধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	ল্ + গ (আল্‌গা),	ল্ + ট (পাল্টা),	ল্ + চ (বেল্‌চি)
৯।	পার্শ্বিকধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	ল্ + ন (আল্‌না),	ল্ + ম (কল্‌মা)	
১০।	কম্পিত ধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	র্ + খ (বোর্‌খা),	র্ + দ (পর্দা),	র্ + চ (পরচা)
১১।	কম্পিত ধ্বনি + নাসিক্যধ্বনি--	র্ + ম (বর্মা),	র্ +ণ (ঝর্ণা)	
১২।	তাড়নজাত ধ্বনি + স্পর্শধ্বনি--	ড় + দ (খড়্‌দা),	ড় + ত (পড়্‌তি)	
১৩।	নাসিক্য ধ্বনি + অন্য ধ্বনি--	ন্ + ক (কান্‌কা),	ন্ + প (বোনপো),	ন্ + স (বন্‌সাই)
		ম্ + ছ (গামছা),	ম্ + ত (নিমতা),	ম + ল (আমলা)
		ঙ্ + ত (রাঙ্‌তা),	ঙ্ + ম (রঙ্‌মশাল)	

৩০২.১.২.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। বাংলা যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ করো।

২। দ্বিস্বর ধ্বনি কাকে বলে?

৩। দ্বিস্বর ধ্বনির তালিকাটি উল্লেখ করো।

৪। বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী কৃত বাংলা যৌগিক স্বরের তালিকাটি প্রস্তুত করো।

৫। বাংলা যৌগিক স্বরের সংজ্ঞা দাও। যৌগিক স্বরের প্রকারভেদ দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৬। দ্বিস্বরধ্বনি বলতে কী বোঝায়? বাংলা দ্বিস্বরধ্বনির একটি যুক্তিসঙ্গত তালিকা প্রস্তুত করো।

৭। দ্বিস্বরধ্বনিগুলিকে নিয়মিত ও অনিয়মিত--এই দুই ভাগে ভাগ করার পিছনে কী যুক্তি রয়েছে?

৮। বাংলা দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুস্বর ও পঞ্চস্বর ধ্বনিগুলি দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করো।

৯। সংযুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster) কাকে বলে? বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন-এর গঠনবৈশিষ্ট্য উদাহরণসহ আলোচনা করো।

১০। বাংলায় ব্যঞ্জন-সমাবেশের আনুমানিক সংখ্যা কত? ব্যঞ্জন-সমাবেশের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-এর পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

১১। "ধ্বনি ও হরফ যে এক নয় তার একটা বড় প্রমাণ হল বাংলার যুক্তাক্ষরগুলো।"---এই কথার যৌক্তিকতা কতখানি আলোচনা করো।

১২। "বাংলা শব্দের গঠনে নানা ব্যঞ্জনের সমাবেশে দেখা যায় অপরিসীম বৈচিত্র্য।"--আলোচনা করো।

৩০২.১.২.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। ড. রামেশ্বর শ'--সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯৪ ব.।

২। ড. সুকুমার সেন--ভাষার ইতিবৃত্ত, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬৮।

৩। মোহম্মদ আবদুল হাই--ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধবনিতত্ত্ব, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়--ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, রূপা, ১৯৮৮।

৫। David Crystal–The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge University press, 1987.

৬। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

৭। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৮। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৯। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

১০। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

১১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

১২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

১৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

১৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

১৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

পর্যায় গ্রন্থ-১

একক-৩

বাংলা অবিভাজ্য স্বনিম (মাত্রা, শ্বাসাঘাত, সুরতরঙ্গ, যতি, নাসিক্যীভবন)

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৩.১ : বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

৩০২.১.৩.২ : শ্বাসাঘাত

৩০২.১.৩.৩ : সুরাঘাত

৩০২.১.৩.৪ : যতি

৩০২.১.৩.৫ : দৈর্ঘ্য

৩০২.১.৩.৬ : নাসিক্যভবন

৩০২.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.১.৩.১ : বিভাজ্য স্বনিম ও অবিভাজ্য স্বনিম

স্বনিম দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিভাজ্য স্বনিম (খ) অবিভাজ্য স্বনিম। ধ্বনিও দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিভাজ্য ধ্বনি (খ) অবিভাজ্য ধ্বনি।

কোনও ভাষার বিভাজ্য স্বনিম নির্ণয় করতে হলে প্রথমে ন্যূনতম শব্দজোড় খুঁজে বের করতে হবে। এরপর দেখতে হবে অর্থের পার্থক্য আছে কি না। একের পর এক এই কাজগুলি সেরে শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণ এবং অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলি খুঁজে আলাদা করতে হবে। আর এই ধ্বনিগুলি তখন স্বনিম হবে।

এইবার বাংলা ভাষায় বিভাজ্য স্বনিম কতগুলি আছে, তা আলোচনা করা হল—

পান / pan /—প্ / p /

ফান / p^han /—ফ্ / p^h /

বান / ban /—ব্ / b /

ভান / b^han /—ভ্ / b^h /

তাল / tal /—ত্ / t /

থাল / t^hal /—থ্ / t^h /

দাল / dal /—দ্ / d /

ধাল / d^hal /—ধ / d^h /

টব / tob /—ট্ / t /

ঠব / t^hob /—ঠ্ / t^h /

ডব / dob /—ড্ / d /

ঢব / d^hob /—ঢ্ / d^h /

চার / car /—চ্ / c /

ছার / c^har /—ছ্ / c^h /

জার / Jar /—জ্ / J /

ঝার / J^har /—ঝ্ / J^h /

কান / kan /—ক্ / k /

খান / k^han /—খ্ / k^h /

গান / gan /—গ্ / g /

ঘান / g^han /—ঘ্ / g^h /

এখানে পাওয়া গেল মোট ২০টি বিভাজ্য স্বনিম।

নাসিক্য স্বনিম

রিম / rim /—ম্ / m /

রীন / রিন / rin /—ন্ / n /

রিং / রিঙ্ / riŋ /—ঙ্ / ŋ /

কম্পিত ও পার্শ্বিক স্বনিম

রাশ / ra ʃ /—র্ / r /

লাশ / la ʃ /—ল্ / l /

উষ্ম স্বনিম

শান / ʃan /—শ্ / ʃ /

হান / han /—হ্ / h /

কম্পিত ও তাড়িত

বার / bar /—র্ / r /

বাড় / bar /—ড্ / r /

অর্ধস্বর

মায়া / maẽa /—য়্ / ĕ /

যাওয়া / jaõea /—ওয়্ / õ /

সুতরাং দেখা গেল বাংলা ব্যঞ্জনমালায় বিভাজ্য স্বনিম মোট ৩০টি।

এবারে অবিভাজ্য স্বনিম সম্পর্কে আলোচনার পালা।

অবিভাজ্য স্বনিম

অবিভাজ্য স্বনিম পাঁচ প্রকার। যথা—

(ক) শ্বাসাঘাত

(খ) সুরাঘাত

(গ) যতি

(ঘ) দৈর্ঘ্য

(ঙ) নাসিক্যভবন

■ গলার ভিতর দিয়ে বেশি পরিমাণে ও জোরে শ্বাসবায়ু বের করে গলার পেশিকে শক্ত করে গলার আওয়াজ বাড়িয়ে জোর দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে শ্বাসাঘাত। শ্বাসাঘাত দু-প্রকার। যথা—শব্দ শ্বাসাঘাত ও বাক্য শ্বাসাঘাত।

সুরের তীব্রতা বাড়িয়ে কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপর জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত বলে। আর ওই সুরাঘাতের হ্রাসবৃদ্ধিগত প্রয়োগ কোনও বাক্যের সুরে তীব্রতর ওঠানামা ঘটিয়ে বাক্যটির সামগ্রিক অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকলে, সেই সুরের ওঠানামাকে সুরতরঙ্গ বলে। সুরতরঙ্গ তিন প্রকার। যথা—

১। ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী।

২। নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী।

৩। সমান্তরাল।

দুটি শব্দ বা সন্নিহিত শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটির শেষ বর্ণ বা ধ্বনি ও দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ বা ধ্বনির মধ্যে যে বিরতি থাকে, তাকে যতি বলে। যতি চার প্রকারের হতে পারে। যথা—(ক) বিরতি (খ) সংযুক্তি (গ) লঘু যতি (ঘ) পূর্ণ যতি। এছাড়া প্রধানত যতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১। বাহ্য উন্মক্ত যতি।

২। অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত যতি।

৩। সংবদ্ধ যতি।

কোনও কোনও ভাষায় কোনও কোনও হ্রস্বধ্বনিকে দীর্ঘ উচ্চারণ করলে একই শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায় সেইসব ভাষায় ধ্বনির হ্রস্বতা থেকে দীর্ঘতা স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে, তাকেই ধ্বনির দৈর্ঘ্য বলে।

কোনও নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পেলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু আংশিকভাবে নাসারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়। তার ফলে এই স্বরধ্বনিতে নাসিক্য অনুরণন যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে নাসিক্যীভবন। যেমন—পঞ্চ > পাঁচ ইত্যাদি।

৩০২.১.৩.২ : শ্বাসাঘাত

ব্যবহারিক জীবনে ভাষা উচ্চারণকালে দেখা যায় বাক্যের সব ধ্বনি বা সব শব্দ সমানভাবে গুরুত্ব পায় না। বা সবগুলি সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করি না। কখনও কখনও কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপর জোর দিই। এই জোর দেবার কৌশল দু-রকমের। যথা—

(ক) শ্বাসঘাত।

(খ) স্বরাঘাত।

শ্বাসঘাত ও স্বরাঘাত বাংলা অবিভাজ্য স্বনিমেরই দুটি ভাগ।

বাক্যের অন্তর্গত কোনও কোনও বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপরে আমরা যদি জোর দিয়ে সেই ধ্বনি বা অক্ষরটিকে উচ্চারণ করি, তবে সেই জোরের মাত্রাকে শ্বাসাঘাত বলে। শ্বাসাঘাত দেওয়ার সময় আমাদের কণ্ঠের শ্বাসনালী কঠিন হয়ে যায়। অর্থাৎ অবিভাজ্য ধ্বনিরই একটি প্রকার হল অবিভাজ্য ধ্বনির এই অবিভাজ্য ধ্বনি যখন কোনও ভাষায় অর্থ নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, তখন তাকে অবিভাজ্য স্বনিমের মর্যাদা দেওয়া হয়। যাই হোক, আমরা এবার শ্বাসাঘাতকে আলোচনার সুবিধার জন্য দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব। যথা—

(ক) শব্দ শ্বাসাঘাত (Word-Stress)

(খ) বাক্য শ্বাসাঘাত (Sentence-Stress)

শব্দ শ্বাসাঘাত

কোনও ভাষার শব্দাস্থিত ধ্বনি বা অক্ষরের উপর জোর দিলে, তার অর্থ যদি পরিবর্তিত হয়ে সেই শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাকে শব্দ শ্বাসাঘাত বলে। শব্দ শ্বাসাঘাতের ক্ষেত্রে বিশেষ ধ্বনি বা অক্ষরের উপর জোর দেওয়া হয়।

শব্দ শ্বাসাঘাতের চিহ্ন মোটামুটি তিন ভাবে বসে। যথা—

(ক) প্রবল বা মুখ্য শ্বাসাঘাত (Strong / Primary Stress)

(খ) মধ্যম বা গৌণ শ্বাসাঘাত (Medium / Secondary Stress)

(গ) দুর্বল বা ক্ষীণ শ্বাসাঘাত (Weak-Stress)

কিন্তু এই সব শ্বাসাঘাতের চিহ্ন ছন্দ বিশ্লেষণের শ্বাসাঘাত থেকে আলাদা প্রকৃতির। এখানে শ্বাসাঘাত বসে এইভাবে—

(ক) শ্বাসাঘাত মুখ্য হলে চিহ্নটি লাইনের একটু উপরে পূর্ণচ্ছেদের মতো ছোট খাড়া হয়ে থাকে

ক. মুখ্য শ্বাসাঘাত 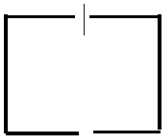

(খ) শ্বাসাঘাত মধ্যম হলে একইভাবে লাইনের নীচে বসে।

খ. মধ্যম শ্বাসাঘাত

(গ) শ্বাসাঘাত ক্ষীণ হলে অক্ষরের আগে একটা ছোট হাইফেন একটু নীচে নামিয়ে বসানো হয়।

গ. ক্ষীণ শ্বাসাঘাত 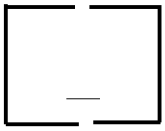

তবে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে ইংরেজি ও জার্মান ভাষার শ্বাসঘাত মতো বাংলা ভাষার শ্বাসাঘাতের ভূমিকা নেই। বাংলা শব্দ শ্বাসাঘাত সম্পর্কে আবদুল হাই বলেছেন যে—ইংরেজির মতো বাংলা stress বা শ্বাসাঘাত প্রধান ভাষা নয়। উক্তিটিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে দুটি বিষয় চোখে পড়ে। যথা—

প্রথমত :

উচ্চারণের দিক থেকে বাংলা শ্বাসাঘাত ইংরেজির মতো উঁচু মাপের নয়।

দ্বিতীয়ত :

বাংলায় শব্দ শ্বাসাঘাত ইংরেজির শব্দ শ্বাসাঘাতের মতো স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুনীতিবাবু বলেছেন—

> "In Bengali stress is not significant i.e. presence or absence of it does-not ofter the senoe or word."

বোঝা যায় বাংলা শ্বাসাঘাতের ভূমিকা ইংরেজির শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণের মতো নেই। তবে ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। যেমন—

বাংলা ভাষায়

অতুল = অ-তুল / o-tul / = ব্যক্তির নাম

অতুল = অ 'তুল / -otul / = অতুলনীয়

এখানে প্রথম অক্ষরের মুখ্য শ্বাসাঘাত ও দ্বিতীয় অক্ষরে দুর্বল বা ক্ষীণ শ্বাসাঘাত পড়েছে। কিন্তু এই দুই শব্দে শ্বাসাঘাতের পার্থক্য সকল বাঙালির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

আবার ইংরেজি ভাষায় দেখা যাচ্ছে—

'in-sult = অপমান

-in'sult = অপমান করা

এখানে প্রথম অক্ষরে মুখ্য শ্বাসাঘাত এবং দ্বিতীয় অক্ষরে দুর্বল শ্বাসাঘাত পড়েছে। ফলে সেটার মানে হয়েছে 'অপমান' কিন্তু পরেরটিতে প্রথমে দুর্বল শ্বাসাঘাত এবং শেষে মুখ্য শ্বাসাঘাত চলে এসেছে। ফলে তার অর্থ হয়ে 'অপমান করা'। কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দে এইভাবে শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তন করা যায় না। কারণ তার ফলে বাংলা ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েও অর্থের পরিবর্তন হয় না।

বিভিন্ন প্রকারের গঠনযুক্ত শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান বাংলায় বিভিন্ন প্রকার হয়। তবে বাংলায় শব্দ শ্বাসাঘাতের অবস্থান যেখানেই হয়ে থাকুক, তা পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন করাও যায় না।

বাক্য শ্বাসাঘাত :

বাক্যে ব্যবহৃত কোনও বিশেষ শব্দের উপর জোর দিলে তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে সেই শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র বাক্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে বাক্য শ্বাসাঘাত বলে। বাক্য শ্বাসাঘাত নিয়ন্ত্রণ

করে সমগ্র বাক্যকে। ধ্বনিবিজ্ঞানে শব্দ শ্বাসাঘাত হিসেবে চিহ্নিত করার রীতি থাকলেও বাক্য শ্বাসাঘাত চিহ্নিত করার কোনও রীতি নেই। অনেকে অবশ্য বাক্য শ্বাসাঘাতকে চিহ্নিত করেছেন শ্বাসাঘাত শব্দটির আগে লাইনের একটু ছোট মত্ত বসিয়ে (০) থাকেন।

বাক্য-শ্বাসাঘাত বিভিন্ন শ্রেণির বাক্যে বিভিন্ন হয়। যেমন—

যুক্তিমূলক বাক্যে অন্য কোনও জিনিসের থেকে একটা জিনিসকে স্বতন্ত্র দেখিয়ে সেই জিনিসটার উপর জোর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অর্থজ্ঞাপক শব্দটির উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

(ক) '⁰মুরগি ডিম পাড়ে'—এখানে 'মুরগি' শব্দটির উপর বাক্য শ্বাসাঘাত দ্বারা বোঝানো হয়েছে একমাত্র 'মুরগি' ডিম পাড়ে।

(খ) 'মুরগি ⁰ডিম পাড়ে'—এখানে 'ডিমের' উপর জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে, 'মুরগি' 'ডিম' পাড়ে অন্য কিছুই পাড়ে না।

(গ) 'মুরগি ডিম ⁰পাড়ে'—এখানে 'পাড়ার' উপর জোর দিয়ে বোঝানো হয়েছে মুরগি 'ডিমই পাড়ে'। অন্য কিছু করে না।

বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ পায় যে সব বাক্যে তাকে আবেগপ্রধান বাক্য বলে। এরকম বাক্যে শ্বাসঘাত গুরুত্ব অনুসারে পড়ে এবং তার ফলে সাধারণ বিস্ময়মূলক বাক্য ও আবেগপ্রধান বাক্যের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। যেমন—

সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য—

আমি ⁰বই পড়ি—এখানে আমার বই পড়ার অভ্যাস আছে বোঝাচ্ছে।

আবেগমূলক বাক্য—

আমি বই ⁰পড়ি—এখানে আমার বই পড়ার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনে এইভাবে বাংলা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ শ্বাসাঘাত বাংলা বাক্যে অর্থ নিয়ন্ত্রিত করছে। তাই বলতে পারি অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও বাক্য শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় তাৎপর্য আছে। তবে মনে রাখতে হবে বাংলা ভাষায় শব্দ শ্বাসাঘাতের স্বনিমীয় গুরুত্ব তেমন নেই। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার, সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য ও সাধারণ বাক্যের গোড়ার দিকে শ্বাসাঘাত পড়ে।

৩০২.১.৩.৩ : সুরাঘাত

সুরকে তীব্র করে কোনও ধ্বনি বা শব্দের উপরে জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত বলে। শব্দের অন্তর্গত কোনও বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের সুরাঘাত দেওয়ার ফলে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হলে হয় শব্দ সুরাঘাত। সুরের তীব্রতা দিয়ে সমগ্র বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণ হলে হয় সুরতরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গ।

প্রাচীন বৈদিক ভাষা ও হোমারের গ্রীক ভাষায় এবং আধুনিক চিনা, তিব্বতি ইত্যাদি ভাষায় সুরাঘাত স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব ভাষায় সুরাঘাত শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। এসব ভাষা শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনি থেকে অন্য ধ্বনিতে সুরাঘাতের স্থান বা প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটলে, শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক চিনা বা তিব্বতি ভাষায় শব্দের অর্থের নিয়ন্ত্রণে সুরাঘাতের ভূমিকা এত বেশি যে একই শব্দ একটু ভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে অর্থের বিরাট বিপর্যয় ঘটে যায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্টই বোঝা যাবে। যেমন—

বৈদিক ভাষায় সুরাঘাত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এইভাবে—

র্রাজপুর = রাজা যার পুত্র (বহুব্রীহি)

রাজর্পুত্র = রাজার পুত্র (ষষ্ঠী পুরুষ)

বৈদিক ভাষাতে স্বরাঘাতের তাৎপর্য এমন ছিল বলেই সুরাঘাতের তিনটি শ্রেণি নির্ণীত হয়েছিল। যথা—

(ক) উদাত্ত (Highe or Acute tone)

(খ) অনুদাত্ত (Low or grave tone)

(গ) স্বরিত (Combined / circumflex tone)

আর আধুনিক ভাষার মধ্যে চিনা ভাষায় সুরাঘাত অর্থের পরিবর্তন ঘটায় এইভাবে—

'মা' শব্দটি চার রকম সুরে উচ্চারণ করলে এর চার রকম অর্থ হয়। যেমন—মা, পাট, ঘোড়া, বকা ইত্যাদি। এছাড়া হোমারের গ্রীক ভাষায় শব্দের ধ্বনি থেকে ধ্বনিতে শব্দ সুরাঘাতের স্থান পরিবর্তনের ফলে অর্থের বদল ঘটে। যেমন—

mu´ria = অনেক (many)

muria´ = দশ লক্ষ (million)

চিনা ভাষায় সুর বিরাট প্রভাব ফেলে। সে কারণে এই ভাষাকে সুরনির্ভর ভাষা বা Tonal Language বলে। তিব্বতি ভাষাও এই শ্রেণিতেই পড়ে।

তবে বাংলা ভাষায় সাধারণত এরকম ঘটে না। বাংলায় শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের কোনো ভূমিকা নেই ঠিক। কিন্তু বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণে যে সুরের কোনও ভূমিকা নেই একথা বলা যায় না। বাংলায় একই বাক্য বিভিন্ন প্রকার সুরতরঙ্গ দিয়ে উচ্চারণ করলে, তার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন দুই একটি অব্যয়, শব্দে সুর যোগ করে বাক্যের সুরের মতো সার্থকতা আনা যেতে পারে। যেমন—'উ', সুরতরঙ্গ অনুপাতে বা সুরাঘাতের ফলে 'উ' এর অর্থ পরিবর্তিত হয়।

সুনীতিকুমার দেখাতে চেয়েছেন যে বাংলায় একটি শব্দের বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করলে তার অর্থ পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু এখানে শব্দ একক হিসেবে গ্রহণীয় নয়, অর্থ বিচারে এই একটি শব্দই অনেকটা গোটা বাক্যের তাৎপর্য আনে। সুতরাং বোঝা যায় শব্দের অর্থনিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা অপরিসীম। তবে বাংলা ভাষার মতো চিনা ভাষায় সুরের ভূমিকা ততটা নেই। তিনি বলেছেন—

"Intonation or pitch of voice as not a

significant element of speech in Bengali"

এই মতকে ফার্গুসন ভুল বুঝেছেন। তিনি বলেছেন শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা না থাকলেও বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রণে সুরের ভূমিকা অপরিসীম। 'A Brief sketch of Bengali phonetics' গ্রন্থে সুনীতিকুমার লিখেছেন—

> "—in a sentence information is a highly expression speech attribute in the language (i.e. Bengali) possibly to a greater extent than in English."

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে সুনীতিকুমার বা মোহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ ভাষাবিদ্ সুর নিয়ে আলোচনা করলেও, তাকে প্রথম সূত্রবদ্ধ করেন চার্লস এ. ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী। তাঁদের সূত্র ও অধ্যাপক ড্যানিয়েল জোনসের সুরতরঙ্গের রৈখিক রূপায়ণ পদ্ধতি অবলম্বন করে বাংলা সুরতরঙ্গের প্রকারভেদ আলোচনা করা যেতে পারে।

সুরতরঙ্গ মূলত তিন প্রকার। যথা—

(১) ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী = ↘ (High falling)

(২) নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী = ↗ (Low rising)

(৩) সমান্তরাল = → (level / Sustained)

সুরের তীব্রতা ও মাত্রাভেদ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হতে পারে। যে কারণে মোটামুটিভাবে সুরে তীব্রতার তিনটি প্রধান গ্রাম বা মাত্রাভেদ নির্ণয় করা হয়। যথা—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন।

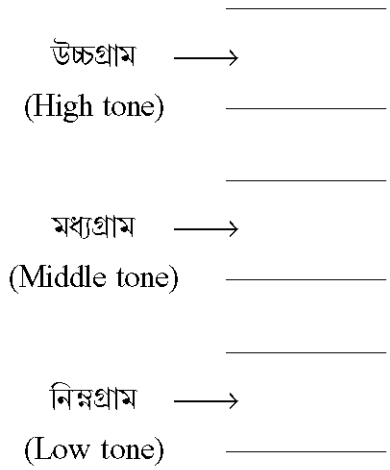

এবার বিভিন্ন প্রকার বাক্যের সাহায্যে বাংলা সুরতরঙ্গের একটা রেখাচিত্র দেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলা দরকার সমস্ত বাক্যে সুর উঁচু থেকে যখনও আরও উঁচুতে, কখনও নিচুতে, কখনও আরও নিচে, কখনও বা নিচু থেকে উঁচুতে ওঠা নামা করার ফলে সুরের রেখাচিত্র তরঙ্গের মতো দেখায়। তাই এই বাক্য সুরের সুরতরঙ্গকে এক বৈশিষ্ট্যময় পরিচয় দেওয়াই যায়। সুরতরঙ্গের বৈষম্যে বাক্যের অর্থভেদ হয়ে থাকে। এবার সাধারণ চলিত বাংলায় বিবৃতিমূলক বাক্যে সুরের উঁচু থেকে নিচে ক্রমিক অবতরণ দেখানো হল। যেমন—

বিবৃতিমূলক বাক্যে এই রকম বাক্য উচ্চারণের ক্ষেত্রে শুরুর দিকে সুর উচ্চগ্রামে থাকে, শেষে নীচে নেমে যায়। যেমন—অভিজিৎ বলে।

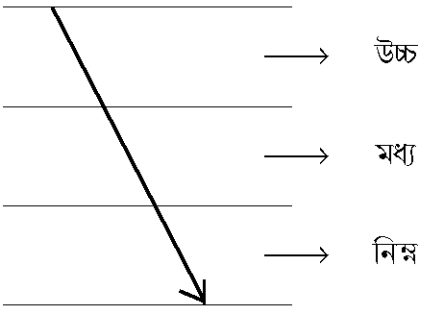

বাংলা সুরতরঙ্গ এক্ষেত্রে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষার মতো।

প্রশ্নবোধক বাক্যে দুই রকমের সুরতরঙ্গ দেখা যায়। যথা—

১। প্রথম শ্রেণির সুরতরঙ্গ নিম্ন থেকে ঊর্ধ্বগামী হয়। যেমন—

মধু কি বলে?

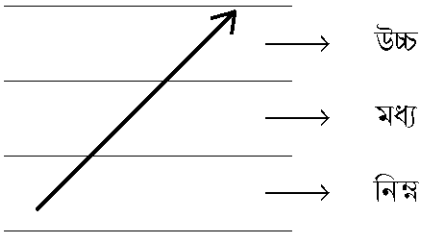

এখানে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর প্রত্যাশা করা হয় এবং ক্রিয়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

২। দ্বিতীয় শ্রেণির প্রশ্নে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' জানতে চাওয়া হয় না। এখানে বিশেষ উত্তরের প্রত্যাশা করা হয়। আর ক্রিয়ার উপর জোর না দিয়ে কর্তার উপর জোর দেওয়া হয়। এখানে সুরতরঙ্গ বিবৃতিমূলক বাক্যের মতোই প্রায় অনেকটা উঁচু থেকে নিচু হয়। যেমন—

মধু কী বলে?

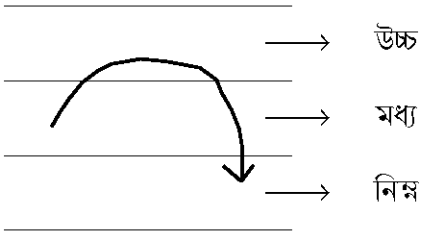

এখানে সুর প্রথমে নরম হয়, তারপর তীব্র হয় ও পরে নরম হয়।

অনেক সময় আমরা 'কি' শব্দে প্রশ্ন বোঝাই না, তুচ্ছার্থে নেতিমূলক কিছু বোঝাতে চাই। এসব ক্ষেত্রে সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। যেমন—

সে কি জানে?

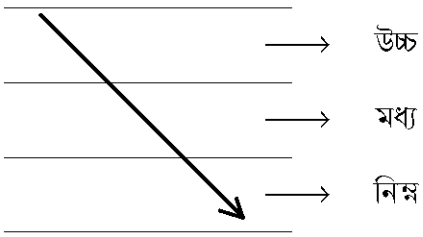

সংশয়মূলক বাক্যে যখন কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আমার আসতে পারি না একটা সংশয়ের মধ্যে থাকি, তখন এই রকম বাক্যে সুরতরঙ্গ ওঠানামা না করে একই রকম থাকে। যেমন—

রূপা মিথ্যা কথা বলে।

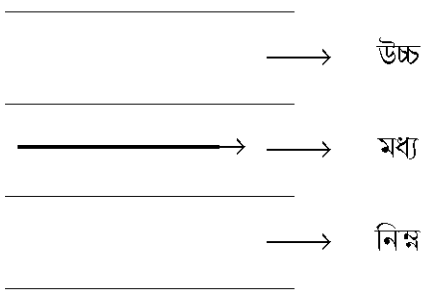

নির্দেশমূলক বাক্যে আদেশ, অনুরোধ, নির্দেশ ইত্যাদি বোঝালে বাক্যের সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে আসে। যেমন—

আপনি একটু বসুন।

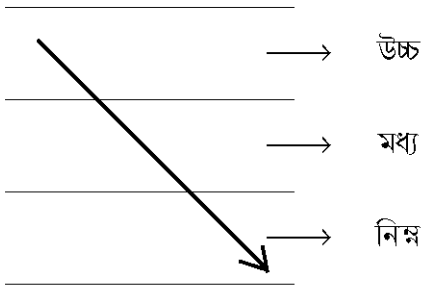

এছাড়াও প্রত্যক্ষ উক্তি ও পরোক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে সুরতরঙ্গ আলাদা হয়। যেমন—

১. প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে বাক্যের সামগ্রিক সুরতরঙ্গ উপর থেকে নীচের দিকে হয়ে আবার উঁচুতে উঠে পুনরায় নীচে নামে। যেমন—

সমীর বলল, "এই কাজ মোহনের দ্বারাই সম্ভব"।

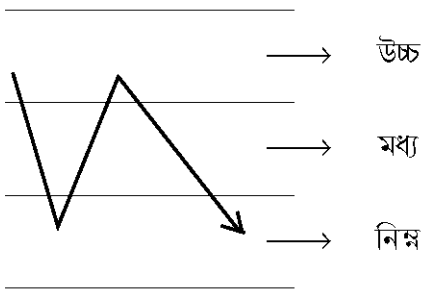

এক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্য বিবৃতিমূলক।

কিন্তু বক্তার বক্তব্য যদি প্রশ্নবোধক হয়, তবে বাক্যটির সুরতরঙ্গ নীচ থেকে উঁচুতে যাবে। যেমন—

সমীর বলল, 'এই কাজ মোহনের দ্বারা কি সম্ভব?'

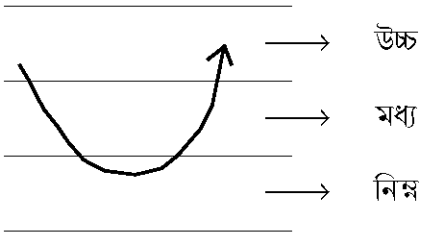

আর প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য সংশয়মূলক হলে বাক্যের সুরতরঙ্গ উঁচু থেকে নীচু হয়ে স্বাভাবিক চলবে। যেমন—বিনয় বলল, 'পিয়া আমাকে অবিশ্বাস করে!'

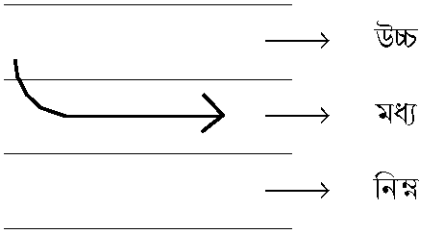

এছাড়া বিভিন্নমুখী ভাব প্রকাশের সময় ভাবানুসারে সুরতরঙ্গের ওঠানামা চলে। আনন্দ, বিস্ময়, আবেগ ইত্যাদি বাক্যের শ্বাসাঘাত যুক্ত শব্দে (বিশেষ শব্দে) জোর দিতে গিয়ে যেমন শ্বাসাঘাত পড়ে, তেমনি বাংলা সুরও তীব্র হয়ে উচ্চগ্রামে উঠে যায়। যেমন—কী অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম, কি বলব।

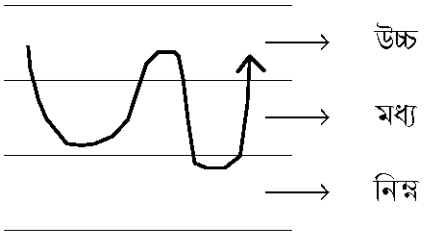

এইভাবে নানা প্রকারে নানা বাক্যের সুরতরঙ্গ বাংলা ভাষায় ওঠানামা করে।

৩০২.১.৩.৪ : যতি

দুটি শব্দ বা সন্নিহিত শব্দ বা সমাসবদ্ধ পদে প্রথমটির শেষ বর্ণ বা ধ্বনি এবং দ্বিতীয় পদের প্রথম বর্ণ বা ধ্বনির মধ্যে যে বিরতি থাকে, তাকেই বলে যতি, আমাদের বাক্‌প্রবাহের ধারায় দুটি স্বনিমের মধ্যবর্তী বিরতি বা পারস্পরিক সংযোগকে যতি বা ধ্বনি সংযোগ বলে। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী A. Hall-এর মতে—

"The way in which phonemes follow each other or are
'joined' in the stream of speech."

গদ্যে বাক্য ও বাক্যাংশের অর্থ অনুসারে ধ্বনিসহ শ্বাসপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু গদ্যে তেমন হয় না। সেখানে নির্দিষ্ট অল্পবিস্তর শ্বাসের বিরাম দিতে হয়। এখানেই গদ্য ও পদ্যের যতিচ্ছেদ আলাদা। গদ্যে যতিচ্ছেদ সুনির্দিষ্ট নয়, বক্তার ইচ্ছাধীন। কিন্তু পদ্যে যতির সংখ্যা সুনির্দিষ্ট এবং যতিক্রম নিয়মিত। যতির দ্বারাই পদ্যে ছত্রের বিভাগ হয়।

যতিকে প্রকাশ করার চিহ্ন চার রকম। যথা—

ক. বিরতি

খ. সংযোগ

গ. স্বল্প বিরতি

ঘ. পূর্ণ বিরতি

কিন্তু পদ্যে ও গদ্যের খাতিরে যতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) লঘু যতি (খ) পূর্ণ যতি। কবিতায় ছন্দের কারণে লাইনে স্বল্পতম প্রয়াসে যে বিরতি দেওয়া হয়, তাকে লঘু যতি বলে। যেমন—

"এ জগতে হায় / সেই বেশি চায়
আছে যার ভুরি / ভুরি।"

কিন্তু অর্থের প্রয়োজনে বা ছন্দের কারণে বাক্যের শেষে যে বিরতি দেওয়া হয়, তাকে পূর্ণ যতি বলে। যেমন—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।"

এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানীরা যতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(১) বাহ্য উন্মুক্ত যতি (External open juncture]

(২) অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি (Internal open juncture)

(৩) ঘনিষ্ঠ বা সংবদ্ধ যতি (Close open juncture]

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিপ্রবাহে দুটি ধ্বনির মধ্যে স্পষ্ট বিরতি থাকলে এবং সেটি কানে শুনেই বোঝা গেলে সেই বিরতিকে বলে বাহ্য উন্মুক্ত যতি। এখানে ধ্বনি দুটির মধ্যে বিরতি থাকে বলে, এখানে ধ্বনি দুটি যুক্ত হয় না। অর্থাৎ ধ্বনি সংযোগ ঘটে না। এটি নেতিমূলক সংযোগ।

বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য :

ক. বাহ্য উন্মুক্ত যতিতে কোনও সংযোগ নেই, কেবল বিরতি লক্ষ করা যায়।

খ. সাধারণ বাক্যের পদগুচ্ছ, বাক্যাংশ এবং বাক্যের দুই প্রান্তে বাহ্য উন্মুক্ত যতি থাকে।

গ. এই প্রকার যতির ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও কোনও ভাষায় বাহ্য যতির ঠিক পরবর্তী অক্ষরটিতে প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন—

সে-বাড়ি যাবে।

এখানে 'সে' ও 'বাড়ি' শব্দের মধ্যে বিরতি চিহ্ন পড়েছে এবং 'বাড়ি' শব্দের প্রথম অক্ষর 'ব'-তে তীব্র শ্বাসাঘাত পড়েছে।

বাহ্য উন্মুক্ত যতিকে ভাষাবিজ্ঞানীরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(ক) বাক্য প্রান্তিক যতি

(খ) বাক্যাংশ বা পদগুচ্ছ প্রান্তিক যতি।

বাক্য প্রান্তিক যতি

এই প্রকার যতির চিহ্ন—'।।' আসলে ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের শেষে সম্পূর্ণরূপে যে বিরতি চিহ্ন দেওয়া হয়, তাকে বাক্য প্রান্তিক যতি বলা হয়।

পদগুচ্ছ প্রান্তিক যতি

এই প্রকার যতির চিহ্ন—'।'। বাক্যের অন্তর্গত দুই বাক্যাংশ বা দুই পদগুচ্ছের মধ্যে যে বিরতি চিহ্ন দেওয়া হয়, তাকে বাক্যাংশ বা পদগুচ্ছ যতি বলে।

আর একপ্রকার যতিও আছে। যেটি পদের শেষে বিরতি চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাকে পদান্তিক যতি বলে। পদান্তিক যতিতে ক্ষণকালের জন্য বিরতি ঘটলে, তাকে বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে ফেলা হয়। আর পদান্তিক যতিতে বিরতি ক্ষণকালের জন্যে হলেও উচ্চারণের বিরাম থাকে না। সেক্ষেত্রে সেই পদান্তিক যতি বাহ্য উন্মুক্ত যতির মধ্যে পড়ে না।

দুটি ধ্বনির মধ্যে কোনও উচ্চারণগত বিরতি থাকে না। আরও বলা যায় সমাসবদ্ধ বা উচ্চারণে ঘনসন্নিবিষ্ট দুটি শব্দ বা পদের মধ্যে আপাত অদৃশ্য যে সূক্ষ্ম বিরতি পদান্তিক যতি রূপে অবস্থান করে, তাকে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি বলে। বাংলায় সাধারণত দুটি শব্দের মাঝখানে যখন কোনও ধ্বনিগত বিরতি শোনা যায় না, অথচ শব্দদুটির মিলন রেখাটি চেনা যায়, তখন শব্দদুটির মাঝখানে আভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি আছে বলা হয়। এই প্রকার যতির চিহ্ন হল (—)।

বৈশিষ্ট্য :

ক. সমাসবদ্ধ বা ঘনসন্নিবিষ্ট শব্দগুলির মাঝখানে এই প্রকার যতি থাকে।

খ. সমাসবদ্ধ পদ না হলেও অনেক সময় অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি থাকতে পারে।

গ. উচ্চারণ বৈচিত্র্য এই প্রকার যতিতে থাকে না।

ঘ. বাংলায় এই উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য সর্বদা দেখা যায় না। অর্থাৎ বাহ্য উন্মুক্ত যতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্বনিমের উচ্চারণগত বৈচিত্র্য সবসময় এই যতিতে দেখা যায় না।

ঙ. সাধারণ দৃষ্টিতে অনায়াসে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি চোখে পড়ে না।

উদাহরণ :

দয়ামায়া = দয়া-মায়া

পার্থসারথী = পার্থ-সারথী ইত্যাদি

সংবদ্ধ যতিতে দুটি ধ্বনির মাঝখানে বাহ্য উন্মুক্ত যতি বা অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি থাকে না। ওইসব যতির কোনও বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় না, এইরকম ধ্বনি দুটির মধ্যে সংবদ্ধ যতি রয়েছে বলে ধরা হয়। এই প্রকার যতির চিহ্ন হল (+)।

বৈশিষ্ট্য :

ক. এইপ্রকার যতি দুটি ধ্বনির সংযোগস্থলে বসে।

খ. বাহ্য উন্মুক্ত যতি ও অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির কোনও বৈশিষ্ট্য সংবদ্ধ যতিতে থাকে না।

গ. এই প্রকার যতিতে যে ধ্বনিগুলি যুক্ত হয়, তা একটি শব্দেই থাকে।

ঘ. সংবদ্ধ যতিতে বিরতি না হয়ে ধ্বনিগুলি পরস্পরের কাছে এসে যুক্ত হয়। অর্থাৎ বিরতির পরিবর্তে সংযুক্তি (+) ক্রিয়া করে।

ঙ. এই যতি উচ্চারণ বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে না।

উদাহরণ :

কিন্তু = কিম + তু

চলতে = চল + তে

হিসেবী = হিসেব + ঈ

চিন্তন = চিন + তন

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির একটা তুলনা করলে দেখা যাবে, দুই প্রকার যতির মধ্যেই কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির সাদৃশ্য :

ক. দুই প্রকার যতিই, যতির এক একটা শ্রেণিবিভাগ।

খ. অভ্যন্তরীণ যতিও সমাসবদ্ধ পদের ভিতরে অবস্থিত। আবার সংবদ্ধ যদিও ভিতরে বা দুটি ধ্বনির মাঝে অবস্থিত।

গ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতিতে বাহ্য উন্মুক্ত যতির বৈশিষ্ট্য যেমন প্রায় থাকে না, তেমনি সংবদ্ধ যতিতেও থাকে না।

ঘ. উভয় প্রকার যতিই উচ্চারণ বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে না।

ঙ. উভয় প্রকার যতিই অনুসন্ধান করে পেতে হয়।

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি ও সংবদ্ধ যতির বৈসাদৃশ্য :

ক. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির চিহ্ন (—)।

অন্যদিকে সংবদ্ধ যতির চিহ্ন (+)।

খ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির জন্য বিরতি (-) বা পদান্তিক যতি ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে সংবদ্ধ যতিতে সংযুক্তিই (+) ব্যবহৃত হয়।

গ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলি একই শব্দের অন্তর্গত ধ্বনি হয়।

ঘ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি বিরতিহীন দুই শব্দের মাঝখানে পড়ে। কিন্তু সংবদ্ধ যতি একই শব্দের দুই অক্ষরের মাঝখানে পড়ে।

ঙ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতি একপ্রকার উন্মুক্ত যতি।

অন্যদিকে সংবদ্ধ যতি পুরোপুরি ঘনিষ্ঠ যতি।

চ. অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত যতির উদাহরণ—

সাথীহারা = সাথী-হারা ইত্যাদি।

অপরপক্ষে সংবদ্ধ যতির উদাহরণ—

জলপাই = জল + পাই ইত্যাদি।

৩০২.১.৩.৫ : দৈর্ঘ্য

বাংলা ভাষায় অবিভাজ্য স্বনিমের পাঁচ প্রকার ভাগের মধ্যে দৈর্ঘ্য এক প্রকার। বাক্যে ব্যাবহারের সময় অথবা অনেকক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে কোনও কোনও শব্দের স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি বেশিক্ষণ ধরে রাখা হয় বলে উচ্চারণের সময় সেই ধ্বনিগুলি প্রলম্বিত হয়। সাধারণ ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে যে মাত্রা, ধ্বনিতত্ত্বে আছে তা ধ্বনিদৈর্ঘ্য নামে পরিচিত। অক্ষর গঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনিদৈর্ঘ্যের ধ্বনিগত গুরুত্ব অপরিসীম। কোনও কোনও ভাষায় একই ধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারণ করলে তাদের মধ্যে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ সেই ভাষায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে।

সংস্কৃত, জার্মান, হিন্দি, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষায় স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

ইংরেজি

Kin / Kin / সম্পর্ক = কিন্-হ্রস্বই

Kean / Ki:n / = তীক্ষ্ণ [কী-ন-দীর্ঘ ঈ]

সংস্কৃত ও হিন্দি

দিন / din / = দিবস

দী-ন / di:n / = দরিদ্র

জার্মান

Lamm / lam / = ভেড়া

Lahm / la:m / = খোঁড়া

তবে বাংলা ভাষার ধ্বনির দৈর্ঘ্য সবসময় স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে না। এর কারণ বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপরে শব্দের অর্থ নির্ভর করে না। বাংলা ভাষায় হ্রস্বস্বর বা দীর্ঘস্বরে স্বনিমীয় কোনও বিরোধ নেই। তাই হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর আলাদা আলাদা স্বনিম নয়। অবশ্য বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি স্বর বানানোর পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন—কূজন (পাখির কাকলি) ও কুজন (মন্দ লোক)। কিন্তু উচ্চারণের সময় এই পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু এইসব শব্দের উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নেই। আর এজন্যই বাংলায় ব্যাকরণের নির্মিতি অধ্যায়ে 'সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ'—নামক একটা অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা বোঝা যায় বাঙালির প্রকৃত উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নেই। অর্থাৎ ধ্বনির দৈর্ঘ্য বাংলা ভাষায় দেখা যায় না। তবে একটু 'কিন্তু' আছে। যেমন—

"যখন বাড়ি থেকে বের হলে তখন তো পুরোপুরি দিন।"

এই বাক্যে 'দিন' শব্দে 'ই' লিখিত। কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে দীর্ঘস্বরের মতো। কিন্তু—"দিনের বেলায় সূর্যকে আকাশে দেখা যায়" এই বাক্যে 'দিনের' শব্দটি দুটি অক্ষর (দিন + এর) নিয়ে গঠিত। একাধিক অক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দে শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরে স্বরধ্বনি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। তাই এই বাক্যে 'দিনের' শব্দের 'ই' এর উচ্চারণ হ্রস্ব। কিন্তু এদের অর্থের পার্থক্য নেই। দুটি বাক্যই শব্দটি 'দিন' এবং যাদের অর্থ 'দিবস' আর বানানও এক। হ্রস্ব দীর্ঘত্ব নির্ভর করে তার অবস্থানের উপর। অতএব স্বরের উচ্চারণ হ্রস্ব দীর্ঘ হবে শর্তাধীনে। কাজেই তা মূলধ্বনির উপধ্বনি, কিন্তু স্বতন্ত্র ধ্বনিরূপে মর্যাদা পায় না বলে ধ্বনির দৈর্ঘ্য বলা যায় না।

এক থাকা সত্ত্বেও একই ধ্বনির এই হ্রস্বতা দীর্ঘতা নির্ভর করছে বাংলা ভাষায়—

ক. তার অবস্থানের কারণে।

খ. গঠনের কারণে। যেমন—এক অক্ষর দ্বারা গঠিত হলে দীর্ঘতা পেতে পারে।

গ. ব্যবহারের পদ্ধতি অনুসারে।

ঘ. ব্যক্তিবিশেষের বা অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণে।

ঙ. সুরতরঙ্গের কারণে।

চ. শ্বাসাঘাতের কারণে ইত্যাদি।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য কেউ কেউ দেখাতে চেয়েছেন। যেমন—বাংলা ভাষায় 'কি' ও 'কী' শব্দ দুটির অর্থ আলাদা। 'কি' শব্দের অর্থে 'হ্যাঁ'/'না' বোঝায়, আর 'কী' শব্দের অর্থে বিশেষ কোনও দ্রব্য বোঝায়। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

(ক) 'রাম কি খাবে?'

এখানে 'রাম' খাবে কি না, শুধু তাই জানতে চাওয়া হয়েছে।

(খ) রাম কী খাবে?

এখানে 'রাম' কি কি খাবে সেটা জানতে চাওয়া হচ্ছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছ 'কি' ও 'কী' শব্দের 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার এর মধ্যে স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য বর্তমান।

কিন্তু তাঁদের ধারণায় ত্রুটি আছে। কারণ এই দুই বাক্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে মূলত সুরতরঙ্গ ও শ্বাসাঘাতের ফলে, দৈর্ঘ্যের কারণে নয়। যেমন—

প্রথম বাক্যে সুরতরঙ্গ

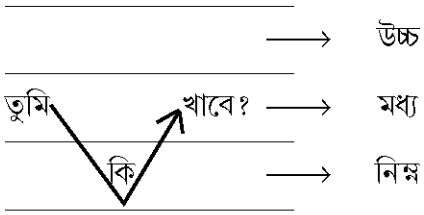

এখানে সুরতরঙ্গ প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাছাড়া বাক্যটিতে শ্বাসাঘাত পড়েছে শেষ শব্দের প্রথমে। যেমন—তুমি কি খাবে?

সুতরাং শ্বাসাঘাতের আগের শব্দের স্বরধ্বনি হ্রস্ব উচ্চারণ হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই।

আর দ্বিতীয় বাক্যে সুরতরঙ্গ

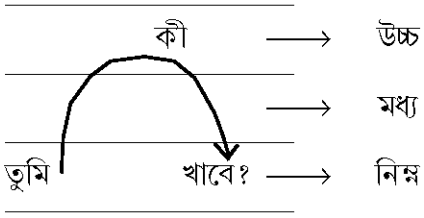

এই বাক্যে সুরতরঙ্গ প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী পরে নিম্নমুখী হয়েছে এবং এখানে শ্বাসাঘাত পড়েছে দ্বিতীয় শব্দে। তাই দ্বিতীয় শব্দের 'কী' এর 'ঈ' এর উচ্চারণ দীর্ঘই হয়েছে। তবে 'কি' এর উচ্চারণ হ্রস্ব হলেও অর্থ কিন্তু 'ঈ' কার যুক্ত 'কী' এর মতো হয়। যেমন—

(ক) রাম কি করছে আর শ্যাম কি করছে তা আমার জানা।

(খ) মধু আর সুমন যে কি খাবে, তা আমার জানা।

এই দুটি বাক্যেই ব্যবহৃত 'কি' শব্দের অর্থ দ্রব্য বা বিষয় তাই বলা যায় পূর্বোক্ত মন্তব্যকারীদের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়।

ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্যকে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের সঙ্গে এক করে ফেলেছেন। তাঁদের মতে ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে দ্বিত্বপ্রয়োগ করে দীর্ঘ ধ্বনি সৃষ্টি করে অর্থপার্থক্য সৃষ্টি করা যায়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন—

> "Length of consonants, commonly described as doulring, other serves to distinguish words in Bengali and is thus of considerable importance."

তিনিও এখানে ব্যঞ্জনদ্বিত্বকেই ব্যঞ্জনের দীর্ঘতা বলেছেন। যেমন—সকলে (হ্রস্বব্যঞ্জন) > কিন্তু সক্কলে (দ্বিত্বব্যঞ্জন)। দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন 'ক্ক' এর জন্য একটু অর্থের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অর্থের পার্থক্য ঘটেছে 'সককলে'। শব্দের শ্বাসাঘাতের জন্য। ধ্বনির দ্বিত্বপ্রাপ্তির জন্য নয়।

আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী বলেছেন, ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যকে পাওয়া যায়। তাঁদের মতে একক ব্যঞ্জন হলে হ্রস্বব্যঞ্জন, আর দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন হল দীর্ঘব্যঞ্জন। কারণ এই দুই ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে। যেমন—'সবাই' শব্দে 'ব' একক ধ্বনি হওয়ায় এটি হ্রস্বব্যঞ্জন। আর 'সব্বাই' শব্দে 'ব' দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ধ্বনি। সুতরাং ধ্বনি ও অর্থ দুইদিকেই পার্থক্য ঘটেছে। এখানে 'ব' ও 'ব্ব' ধ্বনি উভয়ই দৈর্ঘ্যের বৈশিষ্ট্যবাহী। তবে সুনীতিকুমার বা আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী দৈর্ঘ্যকে মানেননি, শ্বাসাঘাতের প্রভাবেই শব্দে অর্থের পার্থক্য ঘটছে। এই কারণে দুটি ধ্বনিকে নিয়ে একসঙ্গে টেনে দীর্ঘধ্বনির মর্যাদা দেওয়া হয় না। যে কারণেই বিশেষজ্ঞ ভাষাবিজ্ঞানীদের অন্যতম মহম্মদ আব্দুল হাই তাঁর 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন—

"দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ.....

একাত্মতাপ্রাপ্ত হয় না।"

বৈজ্ঞানিক বিচারে বাংলায় দীর্ঘব্যঞ্জন বলে কিছু নেই। তাই ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যপূর্ণ নয়। স্বরধ্বনিও এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। সব মিলিয়ে পৃথিবীর যেসব ভাষায় ধ্বনির দৈর্ঘ্য নেই, বাংলা ভাষায়ও তেমন দৈর্ঘ্য স্বনিমীয় তাৎপর্যে দৈর্ঘ্যহীন। কারণ স্বরবর্ণ টেনে টেনে উচ্চারণ করলেও অর্থের কোনও পরিবর্তন হয় না।

৩০২.১.৩.৬ : নাসিক্যভবন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নাক দিয়ে বা একত্রে মুখ ও নাক দিয়ে নির্গত হওয়ার ফলে নাসাগহ্বরে অনুরণন সৃষ্টি করে, সেই ধ্বনিকে বলে নাসিক্য আনুনাসিক ধ্বনি। বাংলা ভাষায় নাসিক্যধ্বনি স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। যেমন—বাংলায় সাতটি স্বরস্বনিম যেমন আছে, তেমনি সাতটি সানুনাসিক স্বরস্বনিমও আছে। সাতটি স্বরস্বনিম হল যথাক্রমে ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাতটি সানুনাসিক স্বরস্বনিম হল—

বিধি / bid^{h}i / = নিয়তি—ই / i /

বিঁধি / b$\tilde{i}$d^{h}i / = বিঁধিয়ে দিই—ঈঁ / $\tilde{i}$ /—(১)

এরা / era / = এই সব লোকেরা—এ / e /

এঁরা / ẽra / = এই সব (সম্মানিত) লোকেরা—এঁ / ẽ /—(২)

ট্যাক / tæk / = তুই টিকে থাক—অ্যা / ae /

ট্যাঁক / tæ̃k / = কোমরের কাপড়ে টাকা রাখার জায়গা—অ্যাঁ / æ̃ /—(৩)

ছাদ / c^had / = ঘরের ছাদ—আ / a /

ছাঁদ / c^hãd / = গড়ন—আঁ / ã /—(৪)

গদ / god / = অতি ভোজনে পেটে অস্বস্তি—অ / o /

গঁদ / gõd / = আঠা—অঁ / õ /—(৫)

ধোয়া / d^hoẽa / = পরিষ্কার করা—ও / o /

ধোঁয়া / d^hõẽa / = ধূম—ওঁ / õ /—(৬)

কুড়ি / kuri / = বিশ—উ / u /

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুঁড়ি—উঁ / ũ /—(৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলায় সাতটি আনুনাসিক স্বর ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ এবং উঁ স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করেছে।

নাস্যিকীভবনের ফলে ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় ও অর্থের পার্থক্য ঘটে। হিন্দি ও ফরাসি ভাষাতেও এই সানুনাসিক ধ্বনি স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। বাংলার সঙ্গে এই দিক থেকে হিন্দি বা ফরাসির মিল রয়েছে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। যেমন—

বাংলায়

কুড়ি / kuri / = বিশ

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুড়ি

হিন্দি

আধী / ad^{h}i / = অর্ধেক

আঁধী / ãd^{h}i / = ঝড়

ফরাসি

essdi / e∫e / = চেষ্টা

essdim / eʃem / = ভিড়

তাহলে বোঝা যায় বাংলা, হিন্দি ও ফরাসিতে সানুনাসিক ধ্বনির স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করে। নাসিক্যীভবনের ফলে ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং অর্থের পার্থক্য ঘটায়।

৩০২.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২. স্বনিমের শ্রেণিবিভাগ করো। এই প্রসঙ্গে অবিভাজ্য স্বনিমের পর্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৩. 'শ্বাসাঘাত' বলতে কী বোঝো? বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাতবিধি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪. সুরাঘাতের সংজ্ঞা দাও। বিভিন্ন বাক্যে সুরাঘাতের রৈখিক চিত্র অঙ্কন করো।

৫. যতি কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার যতির শ্রেণিবিভাগ করে উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়ে দাও।

৬. দৈর্ঘ্য বলতে কী বোঝো? বাংলা ধ্বনির দৈর্ঘ্য মূলত কিসের উপর নির্ভর করে? উদাহরণসহ তা বুঝিয়ে দাও।

৭. নাসিক্যীভবন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৩০২.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যলোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ৪

বাংলা স্বনিম (স্বরস্বনিম, ব্যাঞ্জনস্বনিম, অনুনাসিক স্বরস্বনিম)

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.১.৪.১ : স্বনিম

৩০২.১.৪.২ : উপধ্বনি

৩০২.১.৪.৩ : পরিপূরক অবস্থান

৩০২.১.৪.৪ : মুক্ত বৈচিত্র্য

৩০২.১.৪.৫ : স্বনিম নির্ণয়ের পদ্ধতি

৩০২.১.৪.৬ : স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য

৩০২.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.১.৪.৮ : সহায়ক প্রশ্নাবলী

৩০২.১.৪.১ : স্বনিম

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে শব্দ সৃষ্টি করে থাকে তার ক্ষুদ্রতম এককটিকে ধ্বনি বলে। আর এই ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পরিক স্বনিমীয় বা মূলধ্বনিগত যে বিরোধ থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (phone) বলে।

স্বনিম কথাটি এসেছে ইংরেজি 'phoneme' শব্দ থেকে। 'phoneme' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক লুই আভে। কিন্তু তিনি শব্দটির আধুনিক অর্থটি জানতেন না। পরবর্তীকালে নানা লোকের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে অবশেষে আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী ফোর্দিনা দ্য সোস্যুর 'phoneme' শব্দটি গ্রহণ করেন। এসব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী মহলে ব্যাপক আলোচনা হয়।

অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞানী প্রিন্স এুবেৎস্কর ও গ্লীসন স্বনিমের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—

"স্বনিম হলো পৃথিবীর কোনও বিশেষ একটি ভাষার প্রায় সমোচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত একক। যাকে আর ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা যায় না।"

কিন্তু এই সংজ্ঞাটি সামগ্রিক সংজ্ঞা হয়ে হয়ে উঠতে পারেনি।

যেমন—'কাল' ও 'ফাল' শব্দ দুটির উচ্চারণ প্রায় একই ধরনের বা কাছাকাছি। আবার এই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য রয়েছে। শব্দ দুটিকে বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যাবে।

কাল = ক্ + আ + ল্ = ক্ + আ + ল্

ফাল = ফ + আ + ল্ = ফ্ + আ + ল্

বৈসাদৃশ্য সাদৃশ্য

এখানে 'ক্' এবং 'ফ' ধ্বনি দুটিতে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আর এই কারণেই শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং—ক্ / k / ও ফ / P^h / দুটি স্বনিম বা মূলধ্বনি

স্বনিম হওয়ার শর্ত :

ক. স্বনিম হতে গেলে প্রায় সমোচ্চারিত শব্দজোড়ের দরকার পড়ে, যাকে ন্যূনতম শব্দজোড় বা 'Minimal pair' বলে।

খ. স্বনিমের শব্দজোড় একই ভাষার হতে হবে। অন্য ভাষার শব্দ হলে তা গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ দুটি শব্দ একই ভাষার হবে।

গ. স্বনিমের শব্দ দুটি প্রায় সমোচ্চারিত হবে। কিন্তু সমোচ্চারিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত পার্থক্য থাকতে হবে।

ঘ. শব্দদুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য থাকতেই হবে।

ঙ. ন্যূনতম শব্দজোড় যে ভাষা থেকে নেওয়া হবে সেই ভাষার বেশিরভাগ মানুষের অবিমিশ্র খাঁটি দেশীয় উচ্চারণ থেকে নিতে হবে।

চ. ন্যূনতম শব্দজোড়ের একটিমাত্র ধ্বনিতে উচ্চারণ বৈচিত্র্য হবে, ধ্বনিতে বেশি পার্থক্য থাকলে চলবে না।

ছ. কোনও ভাষায় যে ধ্বনি একবার স্বনিম বলে বিবেচিত হবে, সেটি সবসময় স্বনিম রূপেই থাকবে।

৩০২.১.৪.২ : উপধ্বনি

যদি দুই বা ততোধিক ধ্বনির অবস্থান এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে একটি আরেকটির স্থানে বসতে পারে না; তবে উচ্চারণগত দিক থেকে ধ্বনিগুলির মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে, তবে সেই ধ্বনিগুলিকে একই মূলধ্বনির উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি বলে।

আবার অন্যভাবে বলা যায়, যদি একটি মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্য তার অবস্থান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও ধ্বনি সংযোগের শর্তাধীন হয়, তা বক্তার খেয়াল মতো বসতে না পারে, তখন মূলধ্বনির সেই উচ্চারণ বৈচিত্রগুলিকে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি (Allophone) বলে।

ভাষাবিজ্ঞানী (জ্যুল ব্লক) পূরক ধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> "If two more sounds are so distributed among the forms of a language that none of then ever occurs in exactly the same position as any of the others, and if all the sounds in question are phonetically similar in the sense of sharing a feature of articulation absent from all other sounds, then they are to be classified together as allophones of the same phoneme."

তবে উপধ্বনি হতে পারে সেই সব ধ্বনি, যেগুলি উচ্চারণের দিক থেকে মূলধ্বনির কাছাকাছি বা প্রায় সমোচ্চারিত কিংবা উচ্চারণের দিক থেকে কোনও না কোনও সাদৃশ্য থাকবে। তবে সেগুলি স্বনিমের উপধ্বনি বা পরকধ্বনি হতে পারে। এক্ষেত্রে ধ্বনিগুলিকে স্বনিমের উপধ্বনি সন্দেহ করে উচ্চারণ প্রকৃতি ও শব্দে তাদের অবস্থানের বিচার করে সন্দেহভাজন জোড় হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তীতে উপধ্বনি রূপে গ্রহণ করা হয়। যেমন—'ক' ও 'খ'—সন্দেহভাজন জোড়। কারণ দুটির উচ্চারণস্থান স্নিগ্ধ তালু। কিন্তু সন্দেহভাজন জোড় হলেই যে উপধ্বনি হবেই, তা কিন্তু নয়।

৩০২.১.৪.৩ : পরিপূরক অবস্থান

মূলধ্বনি বা স্বনিমের উচ্চারণ বৈচিত্র্যগুলি তার নিজস্ব বিশিষ্ট অবস্থান বা ধ্বনি সংযোগের দ্বারা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে একটির স্থানে আর একটি বসতে পারে না। যেমন—'শ্রী' শব্দে তালব্য 'শ' ও 'শীল' শব্দে 'স' উচ্চারিত হতে পারে না। তাই একই মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র্যকে পৃথক স্বনিমরূপে গ্রহণ না করে পৃথক ধ্বনি রূপে গ্রহণ করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন। তাঁর মতে—একাধিক ধ্বনির মধ্যে একটি যখন অন্যটির অবস্থানে বা পরিবেশে বসতে পারে না, তখন ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে আছে বলা হয়। যেমন—ইংরেজিতে যে (ph) ও (p) আছে, সেগুলি সাধারণভাবে একই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হয় না। দুটি ধ্বনি ভিন্নতর ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হলে তাকে পরিপূরক অবস্থান (complementary distribution) বলে। পরিপূরক অবস্থানে দুটি ধ্বনি পরস্পর স্বতন্ত্র পরিবেশে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ উপধ্বনি নির্ণয় করতে হলে ধ্বনিসমূহের অবস্থান শর্তাধীন কি না, ধ্বনিগুলি পরিপূরক অবস্থানে আছে কি না—তা বিচার করতে হয়।

৩০২.১.৪.৪ : মুক্ত বৈচিত্র্য

যেখানে দুটো ধ্বনি অর্থগত কোনও পরিবর্তন ছাড়াই একই পরিবেশে ব্যবহৃত হতে থাকে, সেই পর্যায়ে ধ্বনি দুটিকে যুক্ত পরিবর্তনশীল রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী ল্যাবভের মতে ধ্বনির ক্ষেত্রে মুক্ত বৈচিত্র্য প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একই ভাষাভাষী একটা সামাজিক পরিবেশে ও ধ্বনির একটা বিশেষ পরিবর্তনশীল রূপ ও অন্য একটা স্বতন্ত্র সামাজিক পরিবেশে আর একটা স্বতন্ত্র পরিবর্তনশীল রূপ ব্যবহার করে থাকেন। এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিয়াটাকেই মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় কোনও শব্দের শেষে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি থাকে, তবে বারবার স্বাধীনভাবে তা উচ্চারণের ফলে শব্দের শেষের মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। যেমন—

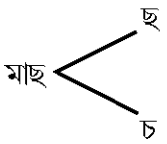

এখানে 'ছ' মহাপ্রাণ ধ্বনি এবং তা বারবার উচ্চারণের ফলে অল্পপ্রাণে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে—

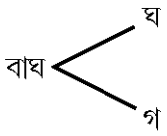

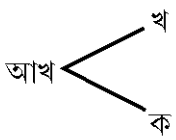

'বাঘ' শব্দে 'ঘ' বারবার স্বাধীনভাবে উচ্চারণের ফলে 'গ' এবং আখ শব্দে 'খ' মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ 'ক' এ পরিণত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে মুক্ত বৈচিত্র্য বলা হয়।

৩০২.১.৪.৫ : স্বনিম নির্ণয়ের পদ্ধতি

কোনও ভাষার স্বনিম নির্ণয়ের জন্যে প্রথমেই দরকার হয় ন্যূনতম শব্দজোড়। তারপর এই ন্যূনতম শব্দজোড় দিয়ে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলিকে বেছে নিতে হয়। দেখতে হয় একটিমাত্র ধ্বনিতে উচ্চারণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে কিনা। তারপর শব্দ দুটির মধ্যে উচ্চারণের এবং অর্থের পার্থক্য সৃষ্টিকারী ধ্বনিগুলি খুঁজে আলাদা করতে হয়। আর এই ধ্বনিগুলিই হল স্বনিম। যেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম শব্দজোড় পাওয়া যায় না, সেখানে কাছাকাছি শব্দজোড় দিয়ে বিচার করা হয়। অথবা দেখা হয় ধ্বনি দুটি পরিপূরক অবস্থানে আছে কিনা। যেসব ধ্বনি সমোচ্চারিত হয় সেই ধ্বনিগুলিকে বিনা প্রমাণে পৃথক স্বনিম বলে ধরে নেওয়া হয়। শব্দের মধ্যে স্বনিমের তিন রকম অবস্থান হতে পারে—আদি, মধ্য, অন্ত্য। দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ ধ্বনির তিন রকম অবস্থাতেই হতে পারে। যথা—

	শব্দের ধ্বনির স্থান	স্বনিম
আদি অবস্থান :	কান / kan /	/ k / ক্ /
	খান / k^han /	/ k^h / খ্ /
মধ্য অবস্থান :	পাতা / pata /	/ p / প /
	মাতা / mata /	/ m / ম্ /
অন্ত অবস্থান :	সুদ / sud /	/ d / দ্ /
	সুধ / sud^h /	/ d^h / ধ্ /

কিন্তু স্বনিম নির্ণয়ের জন্য তিনটি অবস্থানেই স্বনিমীয় বিরোধ দেখার দরকার নেই। অবস্থান যেরকমই হোক না কেন স্বনিম একটাই। তাছাড়া সব ধ্বনিই এই তিনরকম অবস্থানে বসে না। যেমন, বাংলা, ইংরেজি, জার্মানি ভাষায় 'ঙ' (n) শব্দের আদিতে বসে না। আবার ইংরেজিতে 'হ' (h) শব্দের শেষে বসে না। ফরাসিতে 'ঞ' আদিতে বসে না। আবার একবার স্বনিম নির্ণীত হলেই তো সর্বত্র স্বনিম হিসেবে তা গণ্য হবে।

বাংলা স্বরস্বনিম :

ন্যূনতম শব্দজোড়ের মাধ্যমে আদর্শ বাংলা চলিত ভাষায় যে যে স্বরস্বনিম পাওয়া যায়। তা হল—

খিল / k^hil / = দরজার খিল—ই / i /

খেল / k^hel / = 'খেলা' ক্রিয়ায় ধাতু—এ / e /

খ্যাল / k^hæl / = (তুই) খেলা কর্—অ্যা / æ /

খাল / k^hal / = জলের খাল—আ / a /

খল / k^hol / = চতুর—অ / o /

খোল / k^hol / = বাজনা বিশেষ—ও / o /

খুল / k^hul / = 'খোলা' ক্রিয়ার ধাতু—উ / u /

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আদর্শ চলিত বাংলায় সাতটি স্বরস্বনিম আছে।

অনুনাসিক স্বরস্বনিম :

বিধি / bid^hi / = নিয়তি—ই / i /

বিধি / $b\tilde{i}d^hi$ / = বিঁধিয়ে দিই—ইঁ / $\tilde{i}$ /—(১)

এরা / era / = এই সব লোকেরা—এ / e /

এঁরা / $\tilde{e}ra$ / = এই সব (সম্মানিত) লোকেরা—এঁ / $\tilde{e}$ /—(২)

ট্যাক / tæk / = তুই টিকে থাক—অ্যা / ae /

ট্যাঁক / tæk / = কোমরের কাপড়ে টাকা রাখার জায়গা—অ্যাঁ / ãe /—(৩)

ছাদ / c^had / = ঘরের ছাদ—আ / a /

ছাঁদ / $c^hãd$ / = গড়ন—অ্যাঁ / ã /—(৪)

গদ / god / = অতি ভোজনে পেটে অস্বস্তি—অ / o /

গঁদ / gõd / = আঠা—অঁ / õ /—(৫)

ধোয়া / $d^hoẽa$ / = পরিষ্কার করা—ও / o /

ধোঁয়া / $d^hõẽ$ / = ধূম—ওঁ / õ /—(৬)

কুড়ি / kuri / = বিশ—উ / u /

কুঁড়ি / kũri / = ফুলের কুঁড়ি—উঁ / ũ /—(৭)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলায় সাতটি আনুনাসিক স্বর ইঁ, এঁ, অ্যাঁ, আঁ, অঁ, ওঁ ও উঁ স্বনিমীয় তাৎপর্য বহন করেছে।

ব্যঞ্জন স্বনিম :

ন্যূনতম শব্দজোড়ের সাহায্যে আদর্শ বাংলা ভাষার (চলিত) যে যে ব্যঞ্জন স্বনিম পাওয়া যায়, সেগুলি হল—

পান / pan /—প্ / p /

ফান / p^han /—ফ্ / p^h /

বান / ban /—ব্ / b /

ভান / b^han /—ভ্ / b^h /

তাল / tal /—ত্ / t /

থাল / t^hal /—থ্ / t^h /

দাল / dal /—দ্ / d /

ধাল / d^hal /—ধ্ / kd^h /

টন / ton /—ট্ / t /

ঠন / t^hon /—ঠ্ / t^h /

ডন / don /—ড্ / d /

ঢন / d^hon /—ঢ্ / d^h /

চাল / cal /—চ্ / c /

ছাল / c^hal /—ছ্ / c^h /

জাল / Jal /—জ্ / J /

ঝাল / J^hal /—ঝ্ / J^h /

কোন / kon /—ক্ / k /

খোন / k^hon /—খ্ / k^h /

গোন / gon /—গ্ / g /

ঘোন / g^hon /—ঘ্ / g^h /

অর্থাৎ এখানে পাওয়া গেল মোট ২০টি ব্যঞ্জন স্বনিম। এছাড়া যে সব ব্যঞ্জন স্বনিম আছে, সেগুলি হল—

নাসিক্য ব্যঞ্জন স্বনিম

ছিম / c^him /—ম্ / m /

ছীন / ছিন / c^hin /—ন্ / n /

ছিঙ / chi ŋ /—ঙ্ / ং / ŋ /

কম্পিত ও পার্শ্বিক ব্যঞ্জন স্বনিম

রান / ran /—র্ / r /

লান / lan /—ল্ / l /

উষ্ম ব্যঞ্জন স্বনিম

শান / *f*an /—শ্ / *f* /

হান / han /—হ্ / h /

কম্পিত ও তাড়িত ব্যঞ্জন স্বনিম

বার / bar /—র্ / r /

বাড় / bar /—ড় / n /

এছাড়া অর্ধস্বর আছে

ছাটা / c^haẽa /—য় / ĕ /

ছাওয়া / c^haoẽa /—য়্ / ŏ /

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্ধস্বরসহ ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিকে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত যতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, ততগুলি ব্যঞ্জন স্বনিম নেই। অর্থাৎ ঞ, ন, র, ষ, স কে স্বতন্ত্র স্বনিম ধরা হয়নি। কারণ এদের স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই। যা স্বনিম হওয়ার মূল শর্ত।

৩০২.১.৪.৬ : স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য

একটি শব্দকে বিশ্লেষণ করলে এক বা একাধিক বর্ণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধ্বনির কিছু স্বাতন্ত্র্য সূচক বৈশিষ্ট্য আছে। যার জন্য একটি ধ্বনি অন্য ধ্বনি থেকে আলাদা হয়। অনেক সময় দেখা যায় দুটি ধ্বনি উচ্চারণের দিক থেকে একরকম হলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন—'প' ও 'ব' ধ্বনি দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই ধ্বনি দুটি স্পর্শ ধ্বনি, দুটিই ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত। কিন্তু এদের স্বাতন্ত্র্যসূচক পার্থক্য হল 'প' ধ্বনি এবং 'ব' ঘোষ ধ্বনি।

আসলে ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ ঘটে এবং ধ্বনিটি স্বাতন্ত্র্য হয়ে ওঠে। এই বৈশিষ্ট্যকে ধ্বনিটির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য বলে।

য়াকবসন সর্বপ্রথম রোমান ভাষার ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করে স্বনিমের বারোটি (১২) স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। বাংলাতে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিশ্লেষণ করে স্বনিমীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন ফাগুর্সন ও মুনীর চৌধুরী 'phoneme of Bengali' গ্রন্থে। এবং 'Distnctive Features of Bengali' গ্রন্থে অধ্যাপক রামেশ্বর শ্ বাংলা স্বনিমের ৭টি স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। সেগুলি হল—

১. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর বা কণ্ঠের পথে আংশিক বা পূর্ণভাবে বাধা পায় না, সে ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন—অ, আ, ই, এ ইত্যাদি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর বা কণ্ঠের পথে কোনও না কোনও স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। স্বর ও ব্যঞ্জনের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হতে পারে। যেমন—গ

আল—আ + ল্—আ / a / স্বরধ্বনি

খাল—খ + আ + ল্—খ / k^h / ব্যঞ্জনধ্বনি

২. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু শুধুমাত্র মুখ দিয়ে নির্গত হয়, তাকে মৌখিক ধ্বনি বলে। যেমন—ক, গ, ঘ, ত, থ, দ, ধ ইত্যাদি যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মুখ ছাড়াও নাসিকা দিয়ে বের হয় পরবর্তী স্বরের একটি অনুরণন তৈরি করে তাকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। সুতরাং নাসিক্য ও মৌখিক ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

স্বনিমীয় বিরোধ—

মান—ম্ + আ + ন্—ম / m / (নাসিক্য ধ্বনি)

কান—ক্ + আ + ন্—ক / k / (মৌখিক ধ্বনি)

৩. ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় মূল উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপরে নয়, উচ্চারিত ধ্বনির তরঙ্গজাত ফলশ্রুতির উপর ভিত্তি করে হয়। ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় সামগ্রিক শক্তি অনেক বেশি থাকে কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনি উচ্চারণে শক্তি কম থাকে। ঘনীভূত ধ্বনি কেন্দ্রীয় এলাকায় এবং বিক্ষিপ্ত ধ্বনি কেন্দ্রীয় এলাকার চারপাশে থাকে। ঘনীভূত ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর অবরোধের ক্ষেত্র বা জিহ্বার ওপরে ও সামনে বেশি জায়গা ফাঁকা থাকে না, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ধ্বনি উচ্চারণে ফাঁকা থাকে। সুতরাং ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত ধ্বনির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। বাংলা ঘনীভূত ধ্বনিগুলি হল অ, আ, চ, ছ, ক, খ ইত্যাদি। বিক্ষিপ্ত স্বনিম হল—ই, এ, ও, দ, ধ, প, ফ, ব, ভ ইত্যাদি। বাংলায় ঘনীভূত বনাম বিক্ষিপ্ত স্বনিমের বিরোধ দেখানো হল—

দান—দ্ + আ + ন্—আ / d / (ঘনীভূত)

দিন—দ্ + ই + ন্—ই / i / (বিক্ষিপ্ত)

কান—ক্ + আ + ন্—ক্ / k / (ঘনীভূত)

খান—খ্ + আ + ন্—খ্ / k^h / (বিক্ষিপ্ত)

৪. অনেকসময় ধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে শ্বাসবায়ু মুখগহ্বরে বা কণ্ঠপথে হঠাৎ বাধা পায়। ফলে ধ্বনিটির উচ্চারণ প্রক্রিয়া হঠাৎ থেমে যায়। একে বলে আকস্মিক ধ্বনি। যেমন—ক, খ, চ, ছ, জ, দ ইত্যাদি। কিন্তু যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু কণ্ঠপথে বাধা পায় না, ফলে ধ্বনির উচ্চারণ অনেক সময় ধরে চলে। সেই ধ্বনিকে বলে বিলম্বিত ধ্বনি। যেমন—শ, হ ইত্যাদি। এই আকস্মিক ও বিলম্বিত ধ্বনির বিরোধের একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

চাক—চ্ + আ + ক্—চ্ / c / (আকস্মিক)

শাক—শ্ + আ + ক্—ছ্ / c^h / (বিলম্বিত)

৫. উচ্চারণের সময় যে ধ্বনিগুলির উচ্চারণজাত সুর সুরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের সঙ্গে মিশে থাকে না, তাদেরকে বলে সঘোষ ধ্বনি। যেমন—গ, ঘ, জ, ঝ, দ, ধ ইত্যাদি। কিন্তু উচ্চারণের সময় যে ধ্বনির উচ্চারণজাত সুর সুরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুরের সঙ্গে মিশে থাকে, তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন—ক, খ, চ, ছ, ত, থ ইত্যাদি। এই সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির স্বনিমীয় বিরোধটি হল এই রকম—

গাল—গ্ + আ + ল্—গ্ / g / (সঘোষ)

খাল—খ্ + আ + ল্—খ্ / k^h / (অঘোষ)

ঝোল—ঝ্ + ও + ল্—ঝ্ / j^h / (সঘোষ)

ছোল—ছ্ + ও + ল্—ছ্ / c^h / (অঘোষ)

৬. মুখগহ্বরের মাঝামাঝি স্থান থেকে উচ্চারণের ফলে যে ধ্বনিগুলির সুর তীব্র থাকে, তাদের অনুদত্ত ধ্বনি বলে। যেমন—এ, ও, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ ইত্যাদি। কিন্তু মুখগহ্বরের সামনে থেকে যে ধ্বনিগুলি উচ্চারতি হয়, তাদের উচ্চারণের সময় সুর তীব্র থাকে না। এগুলিকে উদাও ধ্বনি বলে। যেমন—প, ফ, ব, ভ, ত, থ, ধ ইত্যাদি। এই দুইয়ের মধ্যে যে স্বনিমীয় বিরোধ আছে, তা হল—

গাট—গ্ + আ + ট্—গ্ / g / (অনুদাত্ত)

ভাট—ভ্ + আ + ট্—ভ্ / b^h / (উদাত্ত)

৭. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় মুখ, কণ্ঠ ইত্যাদি বাগ্ অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। অধিকতর বিকৃত হয়, সেই ধ্বনিকে দৃঢ় ধ্বনি বলে। যেমন—ফ, খ, ঘ, ছ ইত্যাদি। আর যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়

মুখ, কণ্ঠ ইত্যাদি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, বিকৃত হয় না এবং মাংসপেশি সঙ্কুচিত হয় না, তাকে শিথিল ধ্বনি বলে। যেমন—প, ব, ক ইত্যাদি। দৃঢ় বনাম শিথিল ধ্বনির মধ্যে ও স্বনিমীয় বিরোধ আছে। যেমন—

পাল—প্ + আ + ল্—প্ / p / (শিথিল)

ফাল—ফ্ + আ + ল্—ফ্ / p^h / (দৃঢ়)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনি বিভিন্ন প্রকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধ্বনির মধ্যে স্বনিমীয় বিরোধ দেখা দিচ্ছে। তবে য়াকবসন কথিত স্বনিমের স্বাতন্ত্র্যসূচক অন্য বৈশিষ্ট্যগুলি বা সূত্রগুলি বাংলা ভাষায় প্রযোজ্য হয়নি।

৩০২.১.৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। স্বনিম বলতে কী বোঝো? বাংলা ভাষায় স্বনিমের সঙ্গে উপধ্বনির সম্পর্ক নির্ণয় করো।

২। স্বনিমের সংজ্ঞা দাও। এই প্রসঙ্গে উপধ্বনি, পরিপূরক অবস্থান ও মুক্ত বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্য লিখে উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। বাংলা ভাষায় স্বর ও ব্যঞ্জন স্বনিমগুলি নির্ণয় করো।

৩০২.১.৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আব্দুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্‌টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

রূপিম—সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, নির্ণয়পদ্ধতি, নিদা'র পাঁচটি সূত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৫.১ : উদ্দেশ্য

৩০৩.২.৫.২ : প্রস্তাবনা

৩০৩.২.৫.৩ : রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

৩০৩.২.৫.৪ : রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—রূপকল্প ও অক্ষর—রূপকল্প ও শব্দ

৩০৩.২.৫.৫ : রূপকল্পের বিশ্লেষণ

৩০৩.২.৫.৬ : রূপকল্পের সনাক্তকরণ

৩০৩.২.৫.৭ : রূপকল্পের সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

৩০৩.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০৩.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৫.১ : উদ্দেশ্য

- বর্তমান একক পাঠককে শব্দ ও শব্দের গঠন সম্বন্ধে অবহিত করবে।
- শব্দ যে সবসময় অখণ্ড নয়, এক বা একাধিক গঠনগত উপাদান নিয়ে গঠিত পাঠক বর্তমান একক পাঠ করলে তা বুঝতে পারবেন।
- বর্তমান একক পাঠ করলে রূপকল্প (রূপিম, মূলরূপ, রূপমূল) এবং শব্দ যে এক নয় পাঠক তা অনুধাবন করবেন।
- রূপকল্প যে এক শৈলী নয়, তারও যে বৈচিত্র্য আছে বর্তমান এককে পাঠক তার অনুসন্ধান পাবেন।
- বাংলা শব্দরূপের গঠন ও গঠনগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হবেন।
- বাংলা ক্রিয়ার রূপ ও তার গঠনগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও পাঠকের একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা হবে।

৩০২.২.৫.২ : প্রস্তাবনা

ধ্বনিতত্ত্বের পর্বে পাঠক ধ্বনি এবং মূল ধ্বনি (ধ্বনিকল্প, ধ্বনিমূল, ধ্বনিতা, স্বনিম) সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। বর্তমান এককে পরবর্তী স্তর অর্থাৎ ধ্বনিমূলের সমাহার এবং তার অর্থযোজ্যতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে। ভাষায় যেমন ধ্বনিগত একক অর্থাৎ ধ্বনিমূল বা ধ্বনিকল্প থাকে, অর্থবোধক এককের ক্ষেত্রেও ন্যূনতম একক হল রূপকল্প বা রূপিম। সাধারণ ধারণায়, যেভাবে ব্যাকরণে বলা থাকে, ভাষার অর্থপূর্ণ ন্যূনতম একক হল শব্দ। ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের মধ্যেও অর্থপূর্ণ অণু বা একক খোঁজার একটা পদ্ধতি আছে। সেই এককের অনুসন্ধান এবং বর্ণনাই রূপতত্ত্বের মূল আদর্শ। সাধারণের ধারণা শব্দকে ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ মূলত লিখিত রূপের প্রভাব এবং অভিধানের অস্তিত্ব। বাক্যকে লিখিত রূপ দেওয়ার যে পদ্ধতি প্রচলিত তা হল প্রতিটা শব্দের মাঝে যতি বা ছেদের ব্যবহার যা রূপকল্প বা রূপিমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। দ্বিতীয়ত অভিধানে যে শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোর যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা আছে তেমনি সেগুলির নির্দিষ্ট অর্থ আছে।

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের অর্থপূর্ণ উপাদানগুলো চিহ্নিত করা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভাষায় যেমন অখণ্ড শব্দও থাকে তেমনি খণ্ডযোগ্য অর্থপূর্ণ উপাদান সমন্বিত শব্দের ব্যবহারও কম নয়। যেমন সৎ, সততা, সততার-জাতীয় শব্দ উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী 'সৎ' শব্দটি অখণ্ড অর্থাৎ শব্দটিকে আর নতুন করে অর্থপূর্ণ উপাদানে বিশ্লেষণ করা যায় না। কিন্তু 'সততা' শব্দটি খণ্ডযোগ্য, কেননা শব্দটির মধ্যে 'সৎ' নামক পূর্বোক্ত 'সৎ' শব্দটি বতর্মান এবং সেটির সঙ্গে 'তা' নামক একটি উপাদানযুক্ত হয়েছে। 'তা'-বিশ্লেষণযোগ্য কেননা যে উপাদানের সঙ্গে এটি সংযোজিত হয়েছে সেটির মৌলিক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। আবার 'কৃতকার্যতা', 'অসামাজিকতা', 'প্রাসঙ্গিকতা' জাতীয় শব্দে 'তা' নামক উপাদানটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থগত দিক থেকে 'তা' নামক উপাদানটির পূর্বোক্ত শব্দগুলিতে একটা ভূমিকা রয়েছে তা হল বিমূর্তবাচকতা প্রকাশ করা। ব্যাকরণগত দিক থেকে 'সৎ', 'প্রাসঙ্গিক', 'অসামাজিক', 'কৃতকার্য', যখন বিশেষণ শ্রেণিভুক্ত তখন এই শব্দগুলির 'তা'-যুক্ত রূপ (যেমন সততা, কৃতকার্যতা, প্রাসঙ্গিকতা, অসামাজিকতা) বিশেষ্য শব্দরূপে চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ 'তা' নামক উপাদানটি বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত করে। 'সৎ', 'প্রাসঙ্গিক', 'কৃতকার্য', 'অসামাজিক' শব্দগুলি বাক্যে স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হলেও 'তা' উপাদানটি স্বাধীনভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। যেহেতু 'তা' উপাদানটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং ব্যাকরণগত একটি ভূমিকা আছে তাই উপাদানটিকে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় একটি অর্থপূর্ণ একক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই উপাদানটি রূপকল্প বা রূপিম নামে পরিচিত। প্রথাগত ব্যাকরণে এই ধরনের উপাদানকে প্রত্যয় বলে চিহ্নিত করা হয়।

বর্তমানে এককে রূপকল্প চিহ্নিত করার যেমন প্রয়াস নেওয়া হবে তেমনি বাংলা ভাষার রূপকল্পগুলি একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হবে।

৩০২.২.৫.৩ : রূপ-রূপকল্প-রূপবিকল্প

ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে-কোনোও অর্থপূর্ণ উপাদানই এক একটি রূপ। সেই রূপগুলির মধ্যে যখন ধ্বনিতাত্ত্বিক এবং ব্যাকরণগত সমরূপতার সম্পর্ক আলোচনা করা হয় তখনই রূপকল্প এবং রূপবিকল্প (উপরূপ, সহরূপত)-এর প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কতকগুলি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

১.	লোক—লোকেরা	২.	মানুষ—মানুষের
	দাদা—দাদারা		মেয়ে—মেয়ের
	মেয়ে—মেয়েরা		বাবা—বাবার
	ছাত্র—ছাত্ররা		নেতা—নেতার
	গায়িকা—গায়িকারা		লোক—লোকের।

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে দুধরনের এককের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। এক, 'লোক' জাতীয় শব্দ যেখানে বহুবচন তৈরি হয় 'এরা' উপাদানের সহায়তায়, অর্থাৎ লোক + এরা = 'লোকেরা'। আবার 'ছাত্র', 'দাদা', 'মেয়ে', 'গায়িকা' জাতীয় শব্দে বহুবচন তৈরি হয় 'রা' নামক একটি উপাদানের সহায়তায়। 'রা' এবং 'এরা' প্রত্যেকটি উপাদানই এক একটি রূপ, কারণ এগুলির ধ্বনিগত একটা চেহারা রয়েছে এবং একটি অর্থও বিদ্যমান, এখানে ব্যাকরণগত অর্থ বহুবচন। একইভাবে দুই সংখ্যক স্তম্ভেও আমরা দেখি দুধরনের রূপ—এক, 'মানুষ', 'লোক'-জাতীয় শব্দ যেগুলির সম্বন্ধ কারকের রূপ 'এর' নামক উপাদানের সহায়তায় তৈরি হয়। আবার 'মেয়ে', 'বাবা', 'নেতা' জাতীয় শব্দের সম্বন্ধের রূপ তৈরি হয় 'র' নামক উপাদানের সহায়তায়। এখানেও 'র' এবং 'এর' এক একটি রূপ যেহেতু এগুলির ধ্বনিগত একটি গঠন আছে এবং একটি ব্যাকরণিক অর্থও আছে। এবার এক সংখ্যক এবং দুই সংখ্যক স্তম্ভের যে রূপগুলি চিহ্নিত হল সেগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে নেওয়া যাক। এক সংখ্যক স্তম্ভে আমরা দুটি রূপ পেয়েছি 'রা', 'এরা'। দুটি উপাদানের অর্থই এক, অর্থাৎ বহুবচন। কিন্তু এগুলির মধ্যে গঠনগত চেহারা অমিল বর্তমান। যেহেতু রূপগুলির মধ্যে অর্থগত সাম্য বিদ্যমান তাই এই রূপগুলির ব্যবহার শর্তসাপেক্ষ কিনা দেখা যেতে পারে। এক সংখ্যক স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে 'এরা' নামক উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সব শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত (অর্থাৎ যে শব্দগুলি ব্যঞ্জন দিয়ে শেষ হয়) আর 'রা' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেইসব শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি স্বরান্ত (যে শব্দগুলি শেষ হয় স্বর ধ্বনি দিয়ে)। অর্থাৎ 'রা' এবং 'এরা' রূপদুটির ব্যবহারের মধ্যে একটা শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান, যাকে আমরা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বা phonological conditioning বলে চিহ্নিত করতে পারি। 'রা' এবং 'এরা' রূপদুটির অর্থ একই, তফাৎ শুধুমাত্র রূপদুটির অবস্থানে, তাই রূপদুটিকে আমরা একই রূপকল্পের (রূপিমের) দুটি বিকল্প রূপ বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিকল্প রূপই রূপবিকল্প বা উপরূপ বা সহরূপ (Allomorph) বলে পরিচিত।

দুই সংখ্যক স্তম্ভেও আমরা সম্বন্ধ কারক নির্দেশক দুটি রূপের সঙ্গে পরিচিত হই—এক 'র' এবং দুই 'এর'। আগেই বলা হয়েছে এগুলি পৃথকভাবে এক একটি রূপ। যেহেতু রূপদুটির মধ্যে অর্থগত সাম্য বিদ্যমান তাই এক সংখ্যক স্তম্ভের মতই দুই সংখ্যক স্তম্ভেও রূপদুটির মধ্যে ('র' এবং 'এর') অবস্থানগত কোনোও শর্তসাপেক্ষতা আছে কিনা দেখা যেতে পারে। 'র' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সমস্ত শব্দের সঙ্গে যেগুলি ব্যঞ্জনান্ত, এখানে 'লোক' এবং 'মানুষ'। অন্যদিকে 'এর' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে সেই সমস্ত শব্দের সঙ্গে যে শব্দগুলি স্বরান্ত, এখানে 'মেয়ে', 'বাবা', 'নেতা'। এখানেও 'র' এবং 'এর' রূপদুটির মধ্যে অবস্থানগত শর্তসাপেক্ষতা বিদ্যমান। যেহেতু রূপদুটির অর্থ একই, পার্থক্য শুধুমাত্র গঠনগত রূপে, অবস্থানগত কারণে তাই এই রূপদুটিও একই রূপকল্প (রূপিম, রূপমূল, মূলরূপ) হিসেবে চিহ্নিত এবং

ধ্বনিগত পার্থক্যবিশিষ্ট রূপদুটি- ('র' এবং 'এর') রূপবিকল্প (উপরূপ বা সহরূপ) হিসেবে চিহ্নিত। [রূপকল্প এবং রূপবিকল্প পরিভাষা দুটি প্রবাল দাশগুপ্ত লিখিত 'ভাষা বর্ণনার স্তর' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত। রামেশ্বর শ রূপিম, মূলরূপ, উপরূপ পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছেন। সহরূপ পরিভাষাটি আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ব্যবহৃত। যেহেতু রূপমূলের এ অস্তিত্ব অনেকাংশেই ধারণাগত তাই এখানে রূপকল্প শব্দটাই গ্রহণ করা হয়েছে।]

৩০২.২.৫.৪ : রূপকল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য—রূপকর ও অক্ষর—রূপকল্প ও শব্দ

রূপকল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিলেও রূপকল্পের মূল আখ্যানটি দাঁড়িয়ে আছে একটি সহজতম অভিধার উপর, যেমন, ন্যূনতম অর্থবোধক উপাদান অর্থাৎ এমন একটি উপাদান যার আভিধানিক বা ব্যাকরণগত অর্থ আছে এবং ধ্বনিগত গঠনের দিক থেকেও ন্যূনতম একক। অর্থাৎ এককটিকে আর নতুন করে ভাঙা যায় না আর যদি ভাঙা হয় তাহলে অর্থের ব্যাঘাত ঘটে যায়। গ্লীসন রূপকল্পের সংজ্ঞা দেন এইভাবে—রূপকল্প হল ধ্বনিকল্পের ছোট পরম্পরা যেগুলি পৌনঃপুনিক। অর্থাৎ ভাষায় রূপকল্প বা অর্থপূর্ণ ধ্বনিকল্পের পরম্পরা বারবার ব্যবহৃত হয়। তবে সব পৌনঃপুনিক পরম্পরা রূপকল্প নয়। এককথায় রূপকল্পকে 'ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

"Morphemes are generally short sequences of phonemes. These sequences are recurrent—but not all recurrent sequences are morphomes..... Perhaps the best that can be done is to define the morphome as the smallest unit which is grammatically pertinent." [H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, pp. 51.] এই সংজ্ঞা থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়—

১. রূপকল্প ক্ষুদ্রতম একক;

২. রূপকল্প এক বা একাধিক ধ্বনিকল্পের পরম্পরা;

৩. রূপকল্পের একটি অর্থ থাকবে;

৪. ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে রূপকল্প ভাষায় বারবার ব্যবহৃত হবে।

৫. যে-কোনোও ধ্বনিকল্পের পরম্পরা রূপকল্প হিসেবে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। Bloch এবং Trager এর মতে যে-কোনোও গঠনরূপ, মুক্ত অথবা বদ্ধ, যেগুলিকে আর ছোট ছোট অর্থপূর্ণ এককে আর ভাগ করা যায় না সেগুলি রূপকল্প হিসেবে পরিচিত। "Any form, whether free or bound, which can not be divided into smaller meaningful parts is a Morpheme." [Bernard Bloch and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis, 1972, p. 54] এখানে রূপকল্পের অখণ্ডতাই মূল বিবেচ্য, সেই রূপকল্প মুক্ত অথবা বদ্ধ যা-ই হোক না কেন। Hockett-এর মতে রূপকল্প ভাষার বয়ানে ক্ষুদ্রতম এবং এককভাবে অর্থপূর্ণ একক। "Morphemes are the smallest individually meaningful elements in the utterances of a language." [Charles F. Hockette, A Course in Modern Linguistics, 1970, p. 123] এই সংজ্ঞায় রূপকল্পকে ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে যেমন চিহ্নিত করা হয় তেমনি ভাষার বয়ানে একক অর্থপূর্ণ উপাদান হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। নীদার সূত্রেও রূপকল্প ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ একক হিসেবে নির্দেশিত।

রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

১. রূপকল্পের ধ্বনি-শরীর এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ের গঠিত। বাংলা নঞর্থক উপসর্গ 'অ' এবং 'অন' উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এই দুটি রূপ একই অর্থের দ্যোতক—নঞর্থকতা। কিন্তু ধ্বনি-শরীরে পার্থক্য আছে—প্রথমটি যখন একটিমাত্র স্বরধ্বনি সহযোগে গঠিত {অ} দ্বিতীয়টি একটি স্বর এবং একটি নাসিক্যব্যঞ্জন সহযোগে গঠিত। অর্থের মিল অনুসারে রূপদুটি একই রূপকল্প এবং {অন}। 'অ' রূপটি আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনি আছে এমন শব্দের সঙ্গে যুক্ত আর 'অন' রূপটি আদিতে স্বরধ্বনিবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত। 'অ' বা 'অন' রূপকল্পটি যে রূপই ধারণ করুক না কেন তার সে শরীর একটি অথবা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত।

২. ধ্বনিকল্পে পরম্পরা যা রূপকল্প হিসেবে নির্দেশিত হবে সেটি ভাষায় পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হবে। উদাহরণ হিসেবে 'সততা', 'পূর্ণতা', 'সামাজিকতা', 'প্রতিযোগিতা' প্রভৃতি শব্দগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। এখানে প্রতিটি শব্দেই 'তা' নামক একটি উপাদান যুক্ত হয়েছে যাকে আগেই একটি রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যার অর্থ বিমূর্তবাচক বিশেষ্য গঠনগত উপাদান। 'তা' নামক উপাদানটি এই ধরনের বহু বিশেষণ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাই উপাদানটি পৌনঃপুনিক বা recurrent। যদিও ভাষায় এমন কিছু উপাদান থাকতে পারে যেগুলো একক পরিবেশেই ব্যবহৃত হয়।

৩. রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত এককের একটা অর্থ থাকবে। যেমন 'তা' নামক রূপকল্পটির অর্থ 'বিশেষ্য বাচকতা'। ভাষায় একই ধ্বনিকল্পের পরম্পরা পৃথক রূপকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি তার অর্থ ভিন্ন হয় যেমন 'কর্তা', 'দাতা', 'জ্ঞাতা', 'ভর্তা' জাতীয় শব্দেও 'তা' নামক একটি উপাদান আছে (দা + তা = দাতা, জ্ঞা + তা = জ্ঞাতা, কর + তা = কর্তা, ভৃ + তা = ভর্তা) যার অর্থ 'ক্রিয়ার কারক'। তাহলে বোঝা যাচ্ছে একই ধ্বনিকল্পের পরম্পরা হলেও সেগুলি যে একই রূপকল্প হবে তা নাও হাতে পারে, যেমন এখানে দুটি 'তা' রূপকল্পের সন্ধান পাওয়া গেল, একটির অর্থ 'বিশেষ্যবাচকতা' এবং অন্যটি 'ক্রিয়ার কর্তা'। আবার 'তা যে সবসময় অর্থপূর্ণ হবে তা নাও হতে পারে। যেমন 'লতা', 'পাতা' প্রভৃতি শব্দে 'তা' অংশটি বর্তমান থাকলেও সেটির কোনো অর্থ নেই এবং খণ্ডটি বিশ্লেষণযোগ্যও নয়।

রূপকল্প এবং অক্ষরের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হতে পারে যেহেতু দুটিই ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। রূপকল্প এবং অক্ষর ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বিবেচিত হলেও প্রথমটি যখন শব্দের ক্ষুদ্রতম একক দ্বিতীয়টি তখন উচ্চারণের ক্ষুদ্রতম একক। রূপকল্পের প্রাথমিক শর্ত হল, এটির একটি অর্থ থাকতে হবে। অক্ষরের ক্ষেত্রে অর্থ বিবেচ্য নয়। শ্বাসের একক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমবায়ই অক্ষর হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেমন—'লতা' শব্দ দুটি অক্ষরের সমন্বয়—'ল' এবং 'তা' যেগুলির কোনোও অর্থবোধকতা নেই। রূপকল্প একক বা একাধিক অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। 'প্রণাম' শব্দে 'প্র' একটি অক্ষর এবং একটি রূপমূলও বটে যার অর্থ 'প্রকৃষ্ট'। কিন্তু 'লতা' শব্দটি দুটি অক্ষর নিয়ে গঠিত হলেও একটিমাত্র রূপকল্প যেহেতু শব্দটি অর্থগত দিক দিয়ে বিশ্লেষণযোগ্য নয়। তাই অক্ষর যখন একটি উচ্চারণগত একক রূপকল্প একটি অর্থগত একক। কখনও কখনও অক্ষর এবং রূপকল্প একই চেহারা নিয়ে প্রকটিত হলেও এই দুই সত্তার মিলে যাওয়া ব্যতিক্রম মাত্র। যেমন 'প্রণাম' শব্দের 'প্র' কিংবা 'অবিচার' শব্দের 'অ' অক্ষর এবং রূপমূল দুই-ই যদিও 'অ' বা 'প্র' এর অক্ষরগত ও রূপকল্পগত সত্তা ভিন্ন মাত্রায় বিবেচিত হয়।

রূপকল্প এবং শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কটিও আলোচনা সাপেক্ষ। রূপকল্প এবং শব্দ উভয়ই অর্থগত একক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। রূপকল্প ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন 'লতা', 'লোক' বা 'মানুষ' জাতীয় শব্দ এক একটি রূপকল্প যেহেতু এগুলির প্রত্যেকের এক একটি অখণ্ড সত্ত্বা রয়েছে এবং একটি অর্থও রয়েছে। আবার 'অবিচার', 'অকথ্য', 'অকাজ', জাতীয় শব্দে 'অ' নামক উপাদানটি একটি রূপকল্প যেহেতু এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু ভাষায় এর কোনোও স্বাধীন অস্তিত্ব নেই যেহেতু অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে এটি ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে না। তাই এটি একটি বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে শব্দ সবসময়ই স্বাধীনভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং এর একটি অর্থ থাকে। শব্দ যখন মৌলিক, সাধিত এবং যৌগিক রূপ পরিগ্রহ করে রূপকল্প তখন স্বাধীন অথবা বদ্ধ বলে চিহ্নায়িত হয়। যে সব রূপকল্প স্বাধীনভাবে বাক্যে প্রযুক্ত হয় সেগুলি শব্দ হিসেবে গণ্য হতে পারে আর যেসব রূপকল্প স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলি শব্দ হিসেবে গণ্য নয়।

বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী রূপকল্পের বিভিন্ন ধরনের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। প্রাথমিকভাবে রূপকল্পকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—স্বাধীন রূপমূল বা মুক্ত রূপকল্প এবং পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প। যে সমস্ত রূপকল্প ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন—পাখি, নদী, লতা, লাল, সাদা, কালো প্রভৃতি। অর্থাৎ যে রূপকল্প অন্য রূপকল্পের সাহায্য ছাড়াই ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারে, যার নিজস্ব অর্থ রয়েছে, যেটির একটি নির্দিষ্ট ধ্বনি শরীর বর্তমান, যেটি ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয় তাকে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্প বলে। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (১৯৯৭ : ৩০৪—৩০৫) মুক্ত বা স্বাধীন রূপকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য করেছেন :

ক. মুক্ত রূপকল্প অন্য রূপকল্পের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়;

খ. মুক্ত রূপকল্পের অর্থদ্যোতক গুণ বর্তমান;

গ. মুক্ত রূপকল্পের গঠনের যে আকৃতি বিদ্যমান, তার চেয়ে ছোট অংশে বিভাজ্য নয়।

পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্পের নিজস্ব অর্থ আছে এবং ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজ্য নয়। কিন্তু এগুলি স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেবলমাত্র অন্য রূপকল্পের সঙ্গে যুক্তভাবে এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে। কখনও মুক্ত রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত আকারে আবার কখনও বা অন্য একটি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত আকারে এগুলিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—'প্রণাম', 'অনাচার', 'অনুল্লেখ', 'অপরূপ', জাতীয় শব্দে 'প্র', 'অন্', 'অপ' প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার 'প্রবাদ', 'বিবাদ' প্রভৃতি শব্দে দুটি উপাদানই ('প্র' এবং 'বাদ্', 'বি' এবং 'বাদ') পরাধীন বা বদ্ধ, যেহেতু এগুলির কোনোওটিই স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, দুটি রূপকল্পের সহাবস্থানে একটি স্বাধীন শব্দ তৈরি হয়ে যায়। বাংলায় 'রা', 'গুলো', 'দিগ', 'অ', 'অন্' প্রভৃতি উপাদানগুলি (ছেলেরা, ছেলেগুলো, অগণ্য, অনালোকিত, আমাদিকে প্রভৃতি শব্দে) পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

কোনোও কোনোও ভাষাবিজ্ঞানী রূপকল্পকে বিভাজিত এবং অতিরিক্ত এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে রূপকল্প ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং গঠনে স্বরাঘাত, মীড়, যতির কোনোও ভূমিকা থাকে না সেগুলি বিভাজিত রূপকল্প বলে পরিচিত অর্থাৎ ধ্বনি দিয়ে গঠিত রূপকল্পই বিভাজিত রূপকল্প।

আর যে রূপকল্প গঠনে বিভাজিত রূপকল্পের উপর স্বরাঘাত, মীড়, যতির অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে সমশ্রেণির বিভাজিত রূপকল্পের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশিত হয় সেগুলি অতিরিক্ত রূপকল্প বলে পরিচিত। যেমন—পাগল এবং পা + গোল, কবিতা এবং কবি + তা, চানা এবং চা + না, খানা এবং খা + না। প্রতিটি শব্দযুগ্মের প্রথম সদস্য বিভাজিত রূপকল্প এবং দ্বিতীয় সদশ্যে বিভাজিত রূপকল্পের উপর অতিরিক্ত রূপকল্পের প্রভাবজাত অর্থপার্থক্য বর্তমান।

রূপকল্পের প্রয়োগ অনুসারে রূপকল্পকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সাধিত রূপকল্প এবং সম্প্রসারিত রূপকল্প। যে রূপকল্প নতুন ধরনের শব্দসাধনে সহায়তা করে তা সাধিত রূপকল্প হিসেবে পরিচিত। যেমন—'-ইক্', '-তা', 'বে-', '-ই' প্রভৃতি রূপকল্পগুলি সাধিত রূপকল্প। কারণ এই উপাদানগুলি নতুন শব্দ সৃজনে সহায়তা করে। যেমন—সমাজ থেকে সামাজিক, কৃতকার্য থেকে কৃতকার্যতা, হিসাবি থেকে বেহিসাবি, দেশ থেকে দিশি।

যে রূপকল্প ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে সহায়তা করে বা যে রূপকল্পের সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়ার কাল, বচন, পক্ষ, শব্দের কারক, তুলনার মান প্রকাশিত হয় সেই রূপকল্পকে সম্প্রসারিত রূপকল্প বলে। যেমন—

কর + এ = করে	রাম + এর = রামের
দেখ + এ = দেখে	রাম + কে = রামকে

+ চিহ্নের পরস্থিত রূপকল্পগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশক এবং সম্প্রসারিত রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

গঠনগত দিক থেকে সম্প্রসারিত ও সাধিত রূপকল্পের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। (মোরশেদ ১৯৯৭ : ৩২০)

ক. সম্প্রসারিত রূপকল্পের তুলনায় সাধিত রূপকল্প ব্যবহারগতভাবে বিস্তৃত নয়। ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটির বিশেষের সঙ্গে সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে, কিন্তু বিশেষ্যমূলক বা বিশেষণমূলক রূপকল্পের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি সংযুক্তির মাধ্যমে অল্পসংখ্যক বিশেষ্য বিশেষণে বা বিশেষণ বিশেষ্যে পরিণত হতে পারে।

খ. একটি রূপকল্পের সঙ্গে একই সঙ্গে একাধিক সাধিত রূপকল্প সংযুক্ত হতে পারে। যেমন—সমাজ—সামাজিক—সামাজিকতা। এখানে 'সমাজ' এই মৌলিক রূপকল্পটির সঙ্গে বিশেষণীয় রূপকল্প 'ইক্' যেমন যুক্ত হয়েছে (সামাজিক) তেমনি আবার বিমূর্ত বিশেষ্যবাচক 'তা' রূপকল্পও যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একাধিক সাধিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে। কিন্তু মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একাধিক সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে না। যেমন—'রাম' এই রূপকল্পটির সঙ্গে সম্বন্ধবাচক 'এর' যুক্ত হলে (রামের) অন্য কোনোও সম্প্রসারিত রূপকল্প আর যুক্ত হবে না।

গ. সাধিত রূপকল্প যখন একটি উন্মুক্ত বর্গ সম্প্রসারিত রূপকল্প একটি বদ্ধ বর্গ। অর্থাৎ একটি সাধিত রূপকল্পের সঙ্গে যেমন আর একটি সাধিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে (যেমন, সামাজিকতা) তেমনি সাধিত রূপকল্প যুক্ত হওয়ার পরে সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হতে পারে (যেমন—সততার = সততা + সম্বন্ধ বাচক সম্প্রসারিত রূপকল্প-'র')। কিন্তু মৌলিক রূপকল্পের সঙ্গে একবার সম্প্রসারিত রূপকল্প যুক্ত হলে অন্য কোনো রূপকল্প (সাধিত অথবা সম্প্রসারিত) যুক্ত হতে পারে না।

৩০২.২.৫.৫ : রূপকল্পের বিশ্লেষণ

আগেই বলা হয়েছে রূপকল্পের দুটি সত্তা—স্বাধীন বা মুক্ত এবং পরাধীন বা বদ্ধ। স্বাধীন বা মুক্তরূপকল্পের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যা নেই কারণ সেগুলি অন্য রূপকল্পের সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলির স্বাধীন অর্থও যেমন বর্তমান [আন্বয়িক শব্দ (রূপকল্প) ব্যবহার অনুযায়ী অর্থ পরিগ্রহ করে]। তেমনি এগুলি অখণ্ড। পরাধীন বা বদ্ধরূপকল্প বিশ্লেষণই রূপতত্ত্বের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে যেহেতু এগুলি অন্য রূপকল্পের সহযোগে ব্যবহৃত হয়। প্রথাগত ব্যাকরণে নির্দেশিত উপসর্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি এই ধরনের রূপকল্পের আওতায় পড়ে। এই ধরনের রূপকল্প বিশ্লেষণে দুটি শর্ত বিশেষ জরুরি—এক, বিশ্লিষ্ট উপাদান শব্দসাধনে সহায়তা করে কিনা তা দেখা দরকার; দুই, বিশ্লিষ্ট উপাদানটি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে সহায়তা করে কিনা দেখা দরকার; তিন, বিশ্লিষ্ট উপাদানটির নির্দিষ্ট অর্থ আছে কিনা দেখা দরকার; চার, বিশ্লিষ্ট উপাদানটি একাধিক সংযোগে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এই চারটি শর্ত যদি পূরণ করে তাহলে যে-কোনো উপাদানকে রূপকল্প বলে চিহ্নিত করা যায়। যদিও ভূমিকা অনুসারে শব্দসাধন ও শব্দসম্প্রসারণকে দুটি আলাদা শর্তে (এখানে, এক, এবং দুই-সংখ্যক শর্ত) ভাগ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নীচের দুটি স্তম্ভ আলোচনা করা যেতে পারে—

১.	২.
অন্যায্য (অ + ন্যায্য)	করছি (কোর + ছ + ই)
অনিষ্ট (অন + ইষ্ট)	করি (কোর + ই)
বেআব্রু (বে + আব্রু)	করলাম (কোর + ল + আম)
গরমিল (গর + মিল)	ঘরে (ঘর + এ)
যোগান্দার (যোগান + দার)	আমায় (আমা + এ)
নৈতিক (নীতি + ইক্)	দুধের (দুধ + এর)
বৈবাহিক (বিবাহ + ইক্)	লোকে (লোক + এ)
মানসিক (মানস + ইক্)	
ছেলেমি (ছেলে + মি)	
দুরন্তপনা (দুরন্ত + পনা)	
নোন্তা (নুন + তা)	

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে বিভিন্ন ধরনের পরাধীন বা বদ্ধ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে—অ-, অন্-, বে-, গর-, -দার, -ই, -মি, -পনা, -তা। অ-, অন-, বে-, গর- প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন রূপকল্পের আগে বসে নঞর্থক বা অভাব অর্থ প্রকাশ করে। -দার, -ইক্, -মি, -পনা, -তা প্রভৃতি উপাদানগুলি স্বাধীন রূপকল্পের পরে বসে হয় আর একটি বিশেষ্য তৈরি করছে (যোগান্দার, ছেলেমি, দুরন্তপনা) অথবা '-ইক্' বা '-তা'-যোগ করে বিশেষণ পদ তৈরি হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত উপাদানগুলি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প যেহেতু

এগুলির নতুন শব্দ তৈরি করায় ভূমিকা আছে, একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং একাধিক সংযোগে বসার যোগ্যতা আছে।

দুই সংখ্যক স্তম্ভে -ছ, -ই, -ল, আম, -এ, -এর উপাদানগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করছে। -ছ প্রকারবাচক উপাদান, ক্রিয়াপদের ঘটমানতা প্রকাশ করছে, -ল কালবাচক উপাদান অতীত কাল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, -ই এবং -আম পক্ষবাচক উপাদান-প্রথম পক্ষ (পুরুষ) বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, -এ অধিকরণ কারকবাচক উপাদান (ঘরে), -এ গৌণকর্মের প্রকাশক, -এ অনির্দিষ্ট কর্তার চিহ্ন এবং -এর সম্বন্ধের প্রকাশক। এই উপাদানগুলি সবকটি অন্য উপাদানের সহযোগ ছাড়া ব্যবহৃত হতে পারে না, ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশে নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে এবং অখণ্ড। এগুলি পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

৩০২.২.৫.৬ : রূপকল্প সনাক্তকরণ

রূপকল্প সনাক্তকরণের কতকগুলি পদ্ধতি আছে।

১. যে উপাদানটি রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে সেটি যে-কোনো সংযোগেই ধ্বনি শরীরে সমতা বজায় থাকবে। যেমন—পেটুক, মেঘলা, লালচে প্রভৃতি শব্দে -উক, -লা, -চে উপাদানগুলি। এগুলি যে-কোনো অবস্থানেই নিজস্ব চেহারা বজায় রাখে। এগুলি পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। একই চেহারা ছাড়াও অর্থ ও ভূমিকা অনুসারে এগুলি একই থাকে, অর্থাৎ উপাদানগুলি বিশেষণ শব্দ তৈরি করে।

২. অর্থ এক থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো দেখা যায় একাধিক উপাদানের মধ্যে ধ্বনি শরীরে পার্থক্য থাকে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত স্তম্ভগুলি আলোচনা করা যেতে পারে—

১.	অকাজ (অ + কাজ)	২.	সম্প্রচার (সম + প্রচার)
	অকথ্য (অ + কথ্য)		সম্বুদ্ধ (সম + বুদ্ধ)
	অবিচার (অ + বিচার)		সন্ত্রাস (সন্ + ত্রাস)
	অকর্মা (অ + কর্মা)		সন্দর্শন (সন্ + দর্শন)
	অনাচার (অন্ + আচার)		সন্তাপ (সন্ + তাপ)
	অনাস্বাদিত (অন্ + আস্বাদিত)		সংকর্ষণ (সং + কর্ষণ)
	অনাঘ্রাত (অন্ + আঘ্রাত)		সংঘাত (সং + ঘাত)

এক সংখ্যক স্তম্ভে চিহ্নিত শব্দগুলিতে আদি অবস্থানে দুধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে—'অ' এবং 'অন্'। দুটি উপাদানের অর্থ এক, অর্থাৎ নঞর্থক। কিন্তু ধ্বনি শরীরে তফাৎ বর্তমান—প্রথমটি শুধুমাত্র স্বরধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমবায়ে গঠিত। গঠনগত দিক থেকে তফাৎ থাকলেও এই দুটি উপাদানকে একই বলে চিহ্নিত করা যায় যেহেতু ব্যবহারের মধ্যে শর্তসাপেক্ষতা রয়েছে। অর্থাৎ 'অ'-উপাদানটি যুক্ত হয় আদিতে ব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে এবং 'অন্'-উপাদানটি ব্যবহৃত হয় আদিতে স্বরধ্বনিবিশিষ্ট শব্দতে। অর্থাৎ ব্যবহারগত দিক থেকে বা অবস্থানগত দিক থেকে উপাদান দুটির মধ্যে

শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান। তাই উপাদান দুটি একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প বা উপরূপ বা সহরূপ বলে চিহ্নিত হয়।

৩. কখনো কখনো কিছু উপাদানের মধ্যে অর্থগত মিল থাকলেও ধ্বনি শরীরে তফাৎ থাকে কিন্তু এই তফাৎ ধ্বনিগত দিকে থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ এগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা থাকে না। শর্তসাপেক্ষতা না থাকলেও রূপতাত্ত্বিক অবস্থান অনুসারে, উপাদানগুলিকে একই অর্থবিশিষ্ট বলে একটি রূপকল্পের সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক উপাদানগুলি নেওয়া যেতে পারে। 'বৃদ্ধা', 'বুড়ি', 'বেদেনি', 'গোয়ালিনী', 'গায়িকা', 'নায়িকা' শব্দগুলি ধরা যাক। প্রথম শব্দটিতে -আ, দ্বিতীয় শব্দটিতে -ই, তৃতীয় শব্দটিতে -নি, চতুর্থ শব্দটিতে -আনী/ইনী, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শব্দ দুটিতে -ই~আ উপাদানগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই ব্যবহার শব্দকেন্দ্রিক , ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ধরনের ব্যবহারকে রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কোনো উপাদানের ব্যবহার যদি রূপকল্প-কেন্দ্রিক হয় বা রূপকল্পের উপর নির্ভর করে তাকে রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বা Morphological conditioning বলে। এই ধরনের উপাদানগুলিও একই রূপকল্পের ব্যতিক্রমী সদস্য বা রূপবিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রসঙ্গত রূপকল্পের ব্যতিক্রমী সদস্যকে রূপবিকল্প বা সহরূপ বা উপরূপ বলে।

৪. অবস্থান অনুসারে ভিন্ন রূপকল্প বিরোধের সম্পর্কে (Contrast) অবস্থান করে। উদাহরণ হিসেবে

দেশ

দেশের

দেশকে

দেশে

শব্দগুলি নেওয়া যেতে পারে। স্তম্ভে প্রদত্ত শব্দগুলিতে শেষের উপাদান হিসেবে -এর, -কে, -এ, একই অবস্থানে অর্থাৎ 'দেশ' রূপকল্পের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে -'এর' ব্যবহৃত হয় সেখানেই -'কে' অথবা '-এ' ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে এবং প্রত্যেকটি উপাদানের পৃথক ব্যাকরণিক ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি উপাদান পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। সংক্ষেপে রূপকল্প শনাক্তকরণের শর্তগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে—

ক. উচ্চারণ এক অথবা ভিন্ন;

খ. উচ্চারণ ভিন্ন হলে ধ্বনিতাত্ত্বিক অথবা রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা থাকবে;

গ. অর্থ অভিন্ন;

ঘ. পৃথক রূপমূলের বৈপরীত্যের সম্পর্ক।

কখনো কখনো একই ধ্বনিশরীর বিশিষ্ট কিছু রূপ পাওয়া গেলেও অর্থের ভিন্নতা হেতু রূপগুলিকে ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের রূপকল্পগুলিকে সমধ্বনি রূপকল্প বা Homophonous morpheme বলে।

৩০২.২.৫.৭ : রূপকল্প সনাক্তকরণ ও নীদার সূত্র

ভাষাবিজ্ঞানী নীদা (E. A. Nida) রূপকল্প সনাক্তকরণের মাপকাঠি হিসেবে বিশ শতকের চারের দশকের শেষ ভাগে ছয়টি সূত্র নির্দেশ করেন। [Eugene A. Nida, 'The Identification of Morphemes.' *Language*, 24, 1944, pp, 414-441]

১. বচনসমূহের কিছু অংশ থাকবে যেগুলো একই রকম ধ্বনি বা ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত এবং একই অর্থ প্রকাশ করে সেগুলি এক একটি অভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন— -দাল, -পনা, -মি, -ইক্।

২. বচনের কিছু অংশ থাকবে যেগুলি একই অর্থ প্রকাশ করলেও গঠনগত দিক থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা যদি ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে ব্যাখ্যাযোগ্য হয় তবে উপাদানগুলি অভিন্ন অর্থাৎ একই রূপকল্পের অংশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন— 'অ'-, 'অন্'- জাতীয় উপাদান (অবিচার, অনাচার জাতীয় শব্দ) অভিন্ন বলে বিবেচিত যেহেতু দুটি রূপই একই অর্থ প্রকাশ করে এবং গঠনগত ভিন্নতা ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—আদিতে ব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে 'অ'- এবং স্বরধ্বনি বিশিষ্ট শব্দের সঙ্গে 'অন'-। অর্থাৎ 'অ'- এবং 'অন'- একই রূপকল্পের দুই ব্যতিক্রমী সদস্য অর্থাৎ দুটি রূপবিকল্প।

৩. বচনের কিছু অংশ একই অর্থ প্রকাশ করলেও যদি ধ্বনিগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা না যায় এবং সেগুলো যদি পূরক অবস্থানের (Complementary distribution) শর্ত পূরণ করে তবে উপাদানগুলিকে একই রূপকল্পের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। বাংলা স্ত্রীলিঙ্গবাচক উপাদানগুলিকে উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। উপাদানগুলি যেভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন—বৃদ্ধা (বৃদ্ধ + আ), স্ত্রী (-ঈ), বেদেনি (বেদে + নি), সাধিকা (সাধক + ই + আ) তাতে এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে না যাতে করে বলা যেতে পারে এই উপাদানগুলির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা আছে। এই ধরনের ব্যবহার রূপকল্পকেন্দ্রিক এবং উপাদানগুলিকে একই রূপকল্পের সদস্য হিসেবে ধরা হয়।

৪. বচনের কোনো কোনো অংশে অবয়বগত পার্থক্য থাকতে পারে। এই অবয়বগত পার্থক্য যেমন ধ্বনিমূলক হতে পারে আবার শূন্য ধ্বনিমূলও হতে পারে। ধ্বনিমূলকের সঙ্গে শূন্য ধ্বনিমূলক যখন সমরূপতা প্রতিষ্ঠা করে তখন এই শূন্য ধ্বনিমূলক গঠনকে শূন্য রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত বাক্য দুটি নেওয়া যেতে পারে—

সে ঘরে আছে।

সে বাড়ি গেল।

বাক্য দুটিতে এক জায়গায় 'ঘরে' শব্দের সঙ্গে অধিকরণের রূপকল্প '-এ' ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যে 'বাড়ি' শব্দে অধিকরণবাচক শূন্য চিহ্ন (ϕ) ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু দুটি ক্ষেত্রেই অধিকরণের অর্থ প্রকাশিত অথচ শব্দদুটির আনুষ্ঠানিক পার্থক্য এক জায়গায় ধ্বনিমূলক রূপকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত অন্যটিতে ধ্বনিমূলক রূপকল্পের অবর্তমানতার দ্বারা সেই সম্পর্ক প্রকাশিত সেহেতু দ্বিতীয় বাক্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদানটি শূন্য রূপকল্প হিসেবে বিবেচ্য।

৫. নিম্নরূপ শর্তে একাধিক সমধ্বনিমূলক রূপকে ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা যায়—

ক. সমধ্বনিমূলক রূপ যদি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাহলে রূপগুলি ভিন্ন রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন—বাংলায় '-তা' গঠনটি। এই গঠনটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

কর্তা	সততা
দাতা	জনপ্রিয়তা
ভর্তা	মাদকতা
	সচ্ছলতা

দুটি স্তম্ভেই '-তা' নামক উপাদান ব্যবহৃত হলেও এবং একই ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হলেও প্রথম স্তম্ভে যখন ক্রিয়ার 'কর্তা'-র অর্থ প্রকাশ করে তখন দ্বিতীয় স্তম্ভে প্রদত্ত শব্দগুলিতে বিমূর্ত বিশেষ্যের অর্থ প্রকাশিত হয়। ধ্বনিগত গঠন এক হওয়া সত্ত্বেও অর্থগত পার্থক্য এগুলিকে ভিন্ন রূপকল্পে পরিণত করে।

খ. সমধ্বনিমূলক যে সকল রূপের অর্থ 'পরস্পর সম্পর্কযুক্ত' সেগুলিকে অভিন্ন রূপকল্প হিসেবে ধরা হবে যদি আর্থশ্রেণি বৈশিষ্ট্য অবস্থানগত পার্থক্যের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। সমান্তরাল না হলে সেগুলো ভিন্ন রূপমূল হিসেবে চিহ্নিত হবে। যেমন—কাল 'সময় বা দিন'

কাল 'সর্বনাশ'

এগুলি পৃথক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত।

৬. পরিবেশ সাপেক্ষে একটি রূপকল্প পৃথকভাবে চিহ্নিত হতে পারে ঃ

ক. সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পতা;

খ. রূপকল্প বিভিন্ন সমন্বয়ে ব্যবহৃত হতে পারে—এভাবে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অন্তত একটি সমন্বয়ে বা অন্যান্য সমন্বয়ে তা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে পরাধীন বা বদ্ধরূপকল্পতা;

গ. কোনো একক সমন্বয়ে ব্যবহৃত হলেও তা রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে অনন্য রূপকল্প যা (Unique morpheme)। তবে যে উপাদানটির সঙ্গে ব্যবহৃত হবে তা বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করতে পারে অথবা অন্য কোনো উপাদানের সমন্বয়ে থাকলে তা সতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হতে হবে। এই ধরনের রূপকল্প বাংলায় খুবই কম।

[বিস্তৃত পাঠের জন্য দ্রঃ মহম্মদ দানীউল হক্, ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩, পৃ: ১৪৯-১৫২]

৩০২.২.৫.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। রূপকল্পের উদ্দেশ্য কী?

২। রূপকল্প বলতে কী বোঝ?

৩। রূপকল্পের সজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৪। স্বাধীন রূপকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

৫। সাধিত রূপকল্প বলতে কী বোঝ?

১। রূপকল্পের সংজ্ঞা দাও।

২। শর্ত অনুসারে রূপকল্পের বিশ্লেষণ করো দেখাও।

৩। উদাহরণসহ রূপকল্পের বিশ্লেষণ করো।

৪। বাংলা রূপতত্ত্বে রূপকল্পের গুরুত্ব নির্ণয় করো।

১। রূপকল্প সনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলি সূত্রানুসারে লেখো।

২। সূত্রানুসারে রূপকল্পের সনাক্তকরণ করো।

৩। রূপকল্প সনাক্তকরণে নীদার সূত্রটি নির্দেশ করো।

৩০২.২.৫.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা – রামেশ্বর শ।

২। ভাষা বর্ণনার স্তর – প্রবাল দাশগুপ্ত।

৩। আধুনিক ভাষাতত্ত্ব – আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ।

৪। ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৫। প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

১। প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

২। ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৪। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১। প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড) – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

২। ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ – অধ্যাপক ড. সুখেন বিশ্বাস।

৩। ভাষার ইতিবৃত্ত – সুকুমার সেন।

৪। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

একক - ৬

বাংলা রূপমূলের মূলসূত্র—লিঙ্গ বচন

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৬.২ : বচন

৩০৩.২.৬.৩ : লিঙ্গ

৩০৩.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০৩.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৬.১ : ভূমিকা

বাংলা শব্দের গঠনে এবং বাংলা শব্দ যখন বাক্যে প্রযুক্ত হয় তখন তার রূপবৈচিত্র্য এই পর্যায়ে আলোচিত হবে। বাংলা শব্দ যেমন একটিমাত্র রূপকল্প নিয়ে তৈরি হতে পারে তেমনি একাধিক রূপকল্প নিয়েও তৈরি হতে পারে। গঠন অনুসারে প্রথাগত ব্যাকরণে বাংলা শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়—মৌলিক, জটিল এবং যৌগিক শব্দ। মৌলিক শব্দ একটিমাত্র রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়। যেমন—মানুষ, গরু, লোক, পাখি, আকাশ, জল প্রভৃতি। জটিল শব্দ একটি স্বাধীন রূপকল্প এবং একটি পরাধীন বা বদ্ধকল্পের সহযোগে তৈরি হয়। যেমন—অনাদর (অন্ + আদর), গরমিল (গর + মিল), নাবালক (না + বালক), নিখুঁত (নি + খুঁত) প্রভৃতি। যৌগিক শব্দ দুটি বা দুই-এর অধিক স্বাধীন বা মুক্ত রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়। যেমন—গাঙচিল (গাঙ + চিল), নজরুলগীতি (নজরুল + গীতি), রবীন্দ্রসংগীত (রবীন্দ্র + সংগীত)।

দুটি বদ্ধ বা পরাধীন রূপকল্পের সহযোগও জটিল শব্দ তৈরি হতে পারে, যেমন—গমন (গম্ + অন্), বিবাদ (বি + বাদ), প্রবাদ (প্র + বাদ্) প্রভৃতি। জটিল শব্দকে সাধিত শব্দ বলেও চিহ্নিত করা হয় যেহেতু সাধিত রূপকল্পের সহযোগে শব্দটি তৈরি হয়।

অনেক সময় মৌলিক শব্দের যে রূপ সে রূপ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়ে সম্প্রসারিত রূপকল্প গ্রহণ করে ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করে, যেমন—'আমাকে', 'তোমাকে', 'তাকে'। এই শব্দগুলির স্বাধীন বিকল্প হল 'আমি', 'তুমি', 'সে'। সম্প্রসারিত রূপকল্প গ্রহণ করার জন্য মূল বা স্বাধীন রূপকল্পের এই যে বিকল্প চেহারা তাকে **কাণ্ড** বা **প্রতিপাদিক** বলে। অর্থাৎ সম্প্রসারিত রূপকল্পযুক্ত হওয়ার জন্য স্বাধীন রূপকল্পের এই যে বৈকল্পিক চেহারা তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—এক, মূল এবং দুই, কাণ্ড বা প্রাতিপাদিক। মূল রূপকল্প সেগুলিই যেগুলি ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশ করার জন্য সরাসরি রূপকল্প গ্রহণ করে ধ্বনি-শরীরে কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েই। **কাণ্ড** বা **প্রাতিপাদিক** আগেই আলোচনা

করা হয়েছে।

এবার সম্প্রসারিত রূপকল্পের কথা যার সাহায্যে বচন, কারক, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপ—কাল, প্রকার, পক্ষ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

৩০২.২.৬.২ : বচন

বাংলায় বচন প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি রূপকল্প আছে; যেমন—'রা', 'গুলো/গুলি' এবং 'দি' বা 'দিগ'। প্রতিটি রূপকল্পই পরাধীন বা বদ্ধ কারণমুক্ত রূপকল্পের সহযোগ ছাড়া এগুলো ব্যবহৃত হয় না। রূপকল্পগুলির মধ্যে ব্যবহারগত শর্তসাপেক্ষতা রয়েছে; যেমন—মনুষ্যবাচক বিশেষ্য এবং পক্ষবাচক সর্বনামের সঙ্গে 'রা' রূপকল্পটি ব্যবহৃত হয়। যেমন—ছেলেরা (ছেলে + রা), মেয়েরা (মেয়ে + রা), লোকেরা (লোক + এরা), মানুষেরা (মানুষ + এরা) উদাহরণগুলি থেকে 'রা' রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প (উপরূপ বা সহরূপ) চিহ্নিত করা যায় 'রা' এবং 'এরা'। এই দুইটি রূপের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান—'রা' এবং 'এরা'। এই দুটি রূপের সঙ্গে এবং 'এরা' যুক্ত হয় ব্যঞ্জনান্ত রূপকল্পের সঙ্গে। অর্থাৎ রূপকল্পটিকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়—{-রা~এরা}। 'গুলো' এবং 'গুলি' নির্দেশক বহুবচনবাচক রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত এবং মনুষ্য-অমনুষ্য, প্রাণী-অপ্রাণীবাচক বিশেষ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন—ছেলেগুলো, ছেলেগুলি, মেয়েগুলো, মেয়েগুলি, বইগুলো, ছাগলগুলো প্রভৃতি। 'গুলো' এবং 'গুলি'-র মধ্যে ব্যবহারগত সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। 'গুলো' + রূপকল্পের মাধ্যমে যখন সাধারণ বা তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয়, 'গুলি' রূপটি তখন নৈকট্য বা আদর প্রকাশ করে। তির্যক কারকের প্রতিপাদিকের সঙ্গে 'দি' বা 'দিগ' ব্যবহৃত হয়। তবে 'দিগ' রূপটির পরিবর্তে 'দি' বা 'দ'-ই বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন—'আমাদিগকে', 'আমাদের', 'ছেলেদের' [ছেলে + দ (বহুবচন) + এর]।

উপযুক্ত বহুবচনজ্ঞাপক রূপকল্প ছাড়াও 'কুল' (প্রাণিকুল), 'গণ' (প্রজাগণ), 'জাল' (মণিজাল), 'শ্রেণি' (প্রাণিশ্রেণি), 'বর্গ' (নেতৃবর্গ), 'দল' (ছাত্রদল), 'মালা' (আলোকমালা), 'রাশি' (সৈন্যরাশি), 'পাল' (পতঙ্গপাল), 'মণ্ডলী' (দর্শকমণ্ডলী), 'পুঞ্জ' (মেঘপুঞ্জ), 'সমূহ' (বৃক্ষসমূহ), 'মহল' (মহিলামহল) প্রভৃতি উপাদানগুলি তৎসম রূপকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়। তৎভব বাংলায় এগুলির ব্যবহার নেই।

৩০২.২.৬.৩ : লিঙ্গ

বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ প্রকাশক কয়েকটি রূপকল্প রয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি তদ্ভব শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় বাকি রূপকল্পগুলি তৎসম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। তদ্ভব শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ দুটি—'ই' এবং 'নি'। যেমন—কাকি, বেটি, বুড়ি, বেদেনি, জেলেনি। তৎসম শব্দের সঙ্গে প্রযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গবাচক রূপ তিনটি—'-আ', '-আনি', '-ই~আ'। যেমন—বৃদ্ধা, পাঠিকা, নায়িকা, গায়িকা, মাতুলানী।

সংস্কৃতে তিন ধরনের লিঙ্গের অস্তিত্ব ছিল—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ। প্রতিটি লিঙ্গের পৃথক শব্দরূপ ছিল। লিঙ্গ ছিল ব্যাকরণসম্মত অর্থাৎ বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের এবং কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের লিঙ্গগত অন্বয় ছিল। বাংলায় (তদ্ভব) বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রণে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই। পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত বিশেষণে লিঙ্গের কোনো প্রভাব পড়ে না। যেমন—ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে। একমাত্র তৎসম ধারায় স্ত্রীবাচক শব্দের আগে ব্যবহৃত বিশেষণ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ যুক্ত হয়। যেমন—'সুন্দরী স্ত্রী', কিন্তু বাংলায় 'সুন্দর বউ'। কর্তা এবং ক্রিয়াপদের মধ্যেও কোনো লিঙ্গগত

অন্বয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে যেমন পক্ষবাচক ও নির্দেশক সর্বনামের লিঙ্গগত রূপ ছিল—অয়ম্ (পুংলিঙ্গ), ইয়ম্ (স্ত্রীলিঙ্গ), ইদম্ (ক্লীবলিঙ্গ), সঃ (পুংলিঙ্গ, সা (স্ত্রীলিঙ্গ), তৎ (ক্লীবলিঙ্গ) বাংলায় সর্বনামের এই ধরনের কোনো বিভাজন নেই।

৩০২.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

রূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, শূন্য রূপকল্প, স্বাধীন রূপকল্প, পরাধীন রূপকল্প, সমধ্বনি রূপকল্প, সাধিত রূপকল্প, সম্প্রসারিত রূপকল্প।

২। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিন এবং রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৩। রূপকল্প নির্ণয়ের সূত্রগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। বাংলা শব্দরূপে বচন এবং লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কারকের গঠনরূপ আলোচনা করুন।

৬। যুক্তক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? যুক্তক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ করুন এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। পক্ষ বলতে কী বোঝেন? বাংলা পক্ষবাচক রূপকল্পগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩০২.২.৬.৫ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙprint Corporation, 1972.

একক - ৭

কারক

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৭.১ : কারক

৩০৩.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০৩.২.৭.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০২.২.৭.১ : কারক

সংস্কৃত ভাষায় যে অর্থে কারক সম্পর্ক প্রকাশ করা হত, অর্থাৎ 'ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্', বাংলায় সেই অর্থে কারক ব্যবহৃত নয় 'পদান্বয়ি কারকম্' বাংলা কারকের মূল অভিমুখ অর্থাৎ সংস্কৃতের মতো শুধুমাত্র ক্রিয়ায় সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই তা কারকসম্পর্ক বিবেচিত নয়, পদের সঙ্গে পদের সম্পর্কই কারকসম্পর্ক। এই সূত্র অনুযায়ী সংস্কৃতে যখন সম্বন্ধপদ হিসেবে চিহ্নিত, বাংলায় কারক হিসেবে চিহ্নিত। সংস্কৃত ভাষায় ছ-টি কারক এবং দুটি পদ ছিল—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদান কারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক, সম্বন্ধপদ এবং সম্বোধন পদ। প্রতিটি কারকের পৃথক বিভক্তি ছিল। বাংলায় কারকের মূল বৈশিষ্ট্য বিভক্তিহীনতা আবার কখনো বা বিভক্তি প্রয়োগের বৈচিত্র্য। বাংলা কারক বাচক রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ

ϕ (শূন্য) রূপকল্প—	কর্তৃকারকে	**রাম** বাড়ি যাবে।
	মুখ্য কর্মকারকে	সে আমাকে একটা **বই** দিল।
	করণ কারকে	ছাত্রকে **বেত** মারা ভাল নয়।
	অধিকরণ কারকে	সে **বাড়ি** যাবে।
- এ রূপকল্প	কর্তৃকারকে	**লোকে** বলে।
- তে রূপকল্প		**গোরুতে** ঘাস খায়।
	গৌণ কর্মকারকে	সে **আমায়** বলল।
	করণ কারকে	এ **কলমে** লেখা যায় না।
	অপাদান কারকে	কালো **মেঘে** জল হয়।

	অধিকরণ কারকে	সে **ঘরে** গেল।
		সে **বাড়িতে** আছে।
- কে রূপকল্প	কর্মকারকে	সে **রামকে** মারল (মুখ্যকর্ম)
		সে **আমাকে** বলল। (গৌণকর্ম)
- র ~এর রূপকল্প	সম্বন্ধ কারকে	**আমার** ভাই বাড়ি যাবে।
		রামের ছেলে বড় হয়েছে।

-'র' এবং 'এর' রূপ দুটি একই রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প যেহেতু রূপদুটির মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষকতা বর্তমান—ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে 'এর' যুক্ত হয় এবং স্বরান্ত শব্দের সঙ্গে 'র' যুক্ত হয়।

কারক সম্পর্কে প্রকাশ করার জন্য দুটি স্বাধীন রূপকল্প আলোচনা সাপেক্ষ—দিয়ে এবং থেকে। মূলত করণ কারকের অনুসর্গ হিসেবে 'দিয়ে' ব্যবহৃত হলেও ('দ্বারা' আর একটি বিকল্প) অপাদান ও অধিকরণ কারকেও 'দিয়ে' অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

'দিয়ে' রূপকল্প	করণ কারকে	**লাঠি দিয়ে** ডাল ভাঙো।
		আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।
	অপাদান কারক	**চোখ দিয়ে** (চোখ থেকে) জল পড়ছে।
	অধিকরণ কারকে	**রাস্তা দিয়ে** হেঁটে যাও।
'থেকে' রূপকল্প	অপাদান কারকে	**গাছ থেকে** ফল পাড়।

৩০৩.২.৭.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

রূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, শূন্য রূপকল্প, স্বাধীন রূপকল্প, পরাধীন রূপকল্প, সমধ্বনি রূপকল্প, সাধিত রূপকল্প, সম্প্রসারিত রূপকল্প।

২। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিন এবং রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৩। রূপকল্প নির্ণয়ের সূত্রগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। বাংলা শব্দরূপে বচন এবং লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কারকের গঠনরূপ আলোচনা করুন।

৬। যুক্তক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? যুক্তক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ করুন এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। পক্ষ বলতে কী বোঝেন? বাংলা পক্ষবাচক রূপকল্পগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩০৩.২.৭.৩ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

একক - ৮

ক্রিয়ার কাল, পুরুষ

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৮.১ : ক্রিয়ার কাল

৩০৩.২.৮.২ : ক্রিয়ার প্রকার

৩০৩.২.৮.৩ : ক্রিয়ার পক্ষ (পুরুষ) বাচক বিভক্তি

৩০৩.২.৮.৪ : যুক্তক্রিয়া—যৌগিকক্রিয়া-সংযোগমূলক ক্রিয়া

৩০৩.২.৮.৫ : অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ

৩০৩.২.৮.৬ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

৩০৩.২.৮.৭ : সারসংক্ষেপ

৩০৩.২.৮.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩০৩.২.৮.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলি

৩০৩.২.৮.১ : ক্রিয়ার কাল

বাংলা ক্রিয়াপদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

[ধাতু (+ মৌলিক/সাধিত/যুক্ত) + প্রকারবাচক রূপকল্প + কালবাচক রূপকল্প + পক্ষবাচক রূপকল্প]

এটি বাংলা ক্রিয়াপদের গঠনরূপের চরমতম সম্ভাবনা। কোনো ক্ষেত্রে কালবাচক আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রকারবাচক রূপকল্প শূন্য রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত হয়। ক্রিয়াপদের মূলকে তিনভাবে দেখা যায়—স্বয়ংসিদ্ধ বা মৌলিক, যেটিকে আর ভাঙা যায় না, সাধিত, মৌলিক রূপকল্প ও সাধিত রূপকল্পের সহযোগে গঠিত, এবং যুক্ত, একাধিক স্বাধীন রূপকল্পের সহযোগে গঠিত। যেমন—

পড়ছে (পড় + ছ + এ) এখানে ধাতুটি কোনো সহযোগ ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।

পড়াচ্ছে (পড় + আ সাধিত রূপকল্প + চ্ছ + এ) এখানে মূল রূপকল্পের সঙ্গে একটি সাধিত রূপকল্প যোগ করে তারপর কালবাচক, প্রকারবাচক, পক্ষবাচক রূপকল্প যুক্ত হয়েছে।

গাছটা রাস্তায় পড়ে আছে (পড় + এ অসমাপিকা রূপকল্প + আছ + এ) এখানে ক্রিয়াপদটি একাধিক মৌলিক রূপকল্পের সহযোগে গঠিত হয়েছে যা যুক্ত বা যৌগিক ক্রিয়া হিসেবে পরিচিত।

এবার ক্রিয়ার কালবাচক, প্রকারবাচক এবং পক্ষবাচক রূপকল্পগুলির আলোচনা করা হবে।

বাংলা ক্রিয়ার কালের তিন রূপ—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত। তিনটি কাল প্রকাশ করার জন্য তিনটি রূপকল্প—(শূন্য), 'ল' এবং 'ব'।

(শূন্য) রূপকল্প	বর্তমান কাল	সে করে (কর্ + ϕ + এ)
		সে করছে (কর্ + ছ + ϕ + এ)
		সে করেছে (কর্ + এছ + ϕ + এ)
'-ল' রূপকল্প	অতীত কাল	সে করল (কর্ + ল + ও)
		সে করছিল (কর্ + ছ + ইল + ও)
		সে করেছিল (কর্ + এছ + ইল + ও)
'-ব' রূপকল্প	ভবিষ্যত কাল	সে করবে (কর্ + ব + এ)

অতীতবাচক রূপকল্পের দুটি রূপবিকল্প—একটি '-ল' এবং অন্যটি '-ইল'। সাধারণত স্বরান্ত এবং তরল ও পার্শ্বিক ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর পরে 'ল' যুক্ত হয় আর প্রকারবাচক রূপকল্প 'ছ' বা 'এছ' -র পরে 'ইল' যুক্ত হয়। অর্থাৎ অতীতবাচক রূপকল্পটিকে {-ল ~ - ইল} এভাবে দেখানো যেতে পারে।

৩০৩.২.৮.২ : ক্রিয়ার প্রকার

প্রকার অর্থাৎ কীভাবে ক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে তা বোঝাবার জন্য বাংলায় দুটি রূপকল্পের আশ্রয় নেওয়া হয়—'ছ' এবং 'এছ'। '-ছ' ঘটমান প্রকারের প্রকাশক এবং 'এছ' পুরাঘটিত প্রকারের প্রকাশক।

-ছ	ঘটমান	সে করছে (কর্ + ছ + ϕ + এ)
		সে করছিল (কর্ + ছ + ইল + ও)
এছ	পুরাঘটিত	সে করছে (কর্ + এছ + ϕ + এ)
		সে করছিল (কর্ + এছ + ইল + ও)

সাধারণ প্রকার (যেমন—সাধারণ বর্তমান, সাধারণ অতীত, সাধারণ ভবিষ্যত) বোঝানোর জন্য ϕ (শূন্য) রূপকল্প ব্যবহার করা হয়।

৩০৩.২.৮.৩ : ক্রিয়ার পক্ষ (পুরুষ) বাচক বিভক্তি

বাংলায় পক্ষবাচক রূপকল্প ক্রিয়াপদের শেষে প্রযুক্ত হয়। প্রথম পক্ষ (উত্তম পুরুষ), দ্বিতীয় পক্ষ (মধ্যম পুরুষ) এবং তৃতীয় পক্ষ (প্রথম পুরুষ)-এর রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-ই	-আম্/উম্	-ও
আমি করি	আমি করলাম	আমি করব।

দ্বিতীয় পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-ও ~ -ইস ~ -এন	-এ ~ -ই ~ -এন	-এ ~ -ই ~ -এন
তুমি করো	তুমি করলে	তুমি করবে
তুই করিস	তুই করলি	তুই করবি
আপনি করেন	আপনি করলেন	আপনি করবেন

তৃতীয় পক্ষ

বর্তমান কালে ব্যবহৃত	অতীত কালে ব্যবহৃত	ভবিষ্যত কালে ব্যবহৃত
-এ ~ -এন	-ও ~ -এন	-এ ~ -এন
সে করে	সে করল	সে করবে
তিনি করেন	তিনি করলেন	তিনি করবেন

অর্থাৎ প্রথম পক্ষের রূপকল্পে {-ই ~ আম ~ - ও}, রূপতাত্ত্বিক শর্তসাপেক্ষতা বর্তমান— -ই বর্তমানকালে প্রযুক্ত, -আম অতীতকালে প্রযুক্ত এবং -ও ভবিষ্যতকালে প্রযুক্ত। একইভাবে দ্বিতীয় পক্ষর রূপকল্প {-ও ~ ইস ~ ই ~ এ ~ -এন}। -ও বর্তমান কালে এবং -এ অতীত ও ভবিষ্যতকালে প্রযুক্ত। নৈকট্য-দূরত্ব, মর্যাদা প্রভৃতি মাত্রানুসারেও পক্ষবাচক বিভক্তির পরিবর্তন ঘটতে পারে— -ও সাধারণ (তুমি)। - ইস ~ - ই নৈকট্যবাচক বা তুচ্ছার্থক (তুই) এবং -এন (মর্যাদা সূচক)। {-এ ~ - ও ~ -এন} তৃতীয় পক্ষের রূপকল্প— -এ বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে প্রযুক্ত এবং -ও অতীত কালে প্রযুক্ত। {-ও ~ এ} যখন সাধারণ রূপের সঙ্গে ব্যবহৃত তখন {-এন} তৃতীয় পক্ষের সম্ভ্রমার্থক রূপের সঙ্গে ব্যবহৃত।

৩০৩.২.৮.৪ : যুক্তক্রিয়া—যৌগিক ক্রিয়া-সংযোগমূলক ক্রিয়া

একাধিক মৌলিক রূপকল্পের সহযোগে গঠিত ক্রিয়াপদকে যুক্তক্রিয়া বলে। যুক্তক্রিয়া দু ধরনের— সংযোগমূলক এবং যৌগিক ক্রিয়া। দু ধরনের ক্রিয়াপদের মধ্যে মিল হল দু ধরনের ক্রিয়াপদই দ্বিপদময়। তবে সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রথম পদ যখন বিশেষ্য, বিশেষণ বা অনুকার শব্দ দ্বিতীয় পদটি সমাপিকা ক্রিয়া। যেমন—গান করে, মানা করে, ভাল করে, মন্দ করছে, ঝকঝক করছে, কটকট করছে। যৌগিক ক্রিয়ায় দুটি পদই ধাতু—প্রথম পদ অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ এবং দ্বিতীয় পদটি সমাপিকা ক্রিয়ারূপ। যেমন—বসে আছে,

পড়ে আছে, খেয়ে ফেলল, পড়ে গেল, বলে ফেলল প্রভৃতি। দু ধরনের ক্রিয়ারূপের ক্ষেত্রেই দুটি পদের মধ্যে যতি বা ছেদ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদটির যেমন রূপবৈচিত্র্য ঘটে প্রথম পদটির ক্ষেত্রে শুধু অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপকল্প যুক্ত হয়। সংযোগমূলক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদটির রূপবৈচিত্র্য ঘটে থাকে প্রথম পদটির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।

৩০৩.২.৮.৫ : অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ

বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে তিনটি রূপকল্প ব্যবহৃত হয় -এ, -তে এবং -লে। রূপকল্পগুলি যথাক্রমে পুরাঘটিত অসমাপিকা, তুমর্থক অসমাপিকা ও শর্তজ্ঞাপক অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তুমর্থক অসমাপিকা	-তে	করতে, খেতে, যেতে, বলতে।
পুরাঘটিত অসমাপিকা	-এ	করে, খেয়ে, গিয়ে, বলে।
শর্তজ্ঞাপক অসমাপিকা	-লে	করলে, বললে, খেলে, গেলে।

সূত্রাকারে অসমাপিকা রূপকল্প এভাবে দেখানো যেতে পারে—{-এ ~ তে ~ -লে} অর্থাৎ -এ, তে এবং -লে একই রূপকল্পের তিনটি রূপবিকল্প।

৩০৩.২.৮.৬ : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মূল বা ধাতুর সঙ্গে পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত রূপকল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ

'-আ'	বল্ + আ = বলা
	কর + আ = করা
	খা + আ = খাওয়া
'-না'	দা + না = দেনা
	পাওয়া + না = পাওনা
'-অন'	চল্ + অন্ = চলন
	বল্ + অন্ = বলন
	কথ্ + অন্ = কথন
	মর্ + অন্ = মরণ

'-উনি' বাঁধ + উনি = বাঁধুনি

বক্ + উনি = বকুনি

: রূপধ্বনিপ্রকরণ:

একটি রূপকল্প যখন অন্য রূপকল্পের সহযোগে ব্যবহৃত হয় তখন রূপকল্পটির ধ্বনি-শরীরে পরিবর্তন ঘটতে পারে। রূপধ্বনিপ্রকরণ পর্যায়ে এই বিষয়টি আলোচিত হয়। মূল রূপকল্প 'কর্' [কোর] রূপে উচ্চারিত হয় যখন এর সঙ্গে পক্ষবাচক রূপকল্প '-ই' বা কালবাচক রূপকল্প (অতীত এবং ভবিষ্যত) এবং প্রকারবাচক রূপকল্প (ঘটমান এবং পুরাঘটিত) যুক্ত হয়।

৩০৩.২.৮.৭ : সারসংক্ষেপ

শব্দের অন্তর্গত ও ছোট ছোট অর্থপূর্ণ উপাদান থাকতে পারে যা রূপকল্প হিসেবে বর্তমান এককে আলোচিত হয়েছে। রূপকল্প যেমন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তেমনি অন্য রূপকল্পের সহযোগেও ব্যবহৃত হতে পারে যাকে স্বাধীন বা মুক্ত এবং পরাধীন বা বদ্ধ রূপকল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রূপকল্প সাধিত হতে পারে এবং সম্প্রসারিত হতে পারে। সাধিত রূপকল্পের সহযোগে নতুন শব্দ তৈরি করা যায় আর সম্প্রসারিত রূপকল্পের সাহায্যে বাক্যান্তর্গত পদগুলির মধ্যে ব্যাকরণিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। বাংলা রূপকল্পের ক্ষেত্রে বহুবচনজ্ঞাপক রূপকল্প যেমন আছে তেমনি স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার জন্য কয়েকটি রূপকল্প বর্তমান যেগুলি আবার তদ্ভব ও তৎসম পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। বাংলা ক্রিয়ার তিন কাল—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যত; বর্তমান যখন ϕ (শূন্য) রূপকল্পের সাহায্যে প্রকটিত তখন অতীত এবং বর্তমান পৃথক রূপকল্প দ্বারা চিহ্নিত। বাংলায় তিন প্রকার সাধারণ ঘটমান এবং পুরাঘটিত এবং তিন পক্ষ—প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষ।

৩০৩.২.৮.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন :

রূপ, রূপকল্প, রূপবিকল্প, শূন্য রূপকল্প, স্বাধীন রূপকল্প, পরাধীন রূপকল্প, সমধ্বনি রূপকল্প, সাধিত রূপকল্প, সম্প্রসারিত রূপকল্প।

২। রূপকল্পের সংজ্ঞা দিন এবং রূপকল্পের শ্রেণিবিভাগ করুন।

৩। রূপকল্প নির্ণয়ের সূত্রগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৪। বাংলা শব্দরূপে বচন এবং লিঙ্গের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৫। বাংলা কারকের গঠনরূপ আলোচনা করুন।

৬। যুক্তক্রিয়া বলতে কী বোঝেন? যুক্তক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ করুন এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তক্রিয়া উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৭। পক্ষ বলতে কী বোঝেন? বাংলা পক্ষবাচক রূপকল্পগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৩০৩.২.৮.৯ : গ্রন্থাবলি

১। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৩।

২। প্রবাল দাশগুপ্ত, 'ভাষা বর্ণনার স্তর', **নিসর্গ** তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩, পৃ: ১-১১৩।

৩। রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮।

৪। H. A. Gleason, An Introduction to Descriptive Linguistics, Delhi : Oxford IBH, 1961.

৫। C. F. Hockette, A Course in Modern Linguistics. Delhi : Oxford IBH, 1976. Bernard Block and G. L. Trager, Outlines of Linguistic Analysis. New Delhi : Oriental Books Rঙ্গprint Corporation, 1972.

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক-৯

বাক্যতত্ত্ব—প্রথাগত ব্যাকরণের ধারা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.৯.১ : উদ্দেশ্য

৩০২.৩.৯.২ : প্রস্তাবনা

৩০২.৩.৯.৩ : ভাষার একক ও বাক্য

৩০২.৩.৯.৪ : প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্য

৩০২.৩.৯.৫ : অনুশীলনী

৩০২.৩.৯.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

৩০২.৩.৯.১ : উদ্দেশ্য

বাক্য তথা বাংলা বাক্য এবং তার গঠন সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া বর্তমান এককের মূল উদ্দেশ্য। এককটি পাঠ করলে পাঠক প্রথাগত এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্য সম্বন্ধে ধারণা এবং বাক্যের সংগঠন সম্পর্কীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হবেন। প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্য চিহ্নিতকরণে অর্থের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঠক যেমন অবহিত হবেন তেমনই সাংগঠনিক ধারায় অর্থ অপেক্ষা গঠনের গুরুত্ব যে বেশি সে সম্পর্কেও অবহিত হবেন। বর্তমান এককে বাংলা বাক্য, তার সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

৩০২.৩.৯.২ : প্রস্তাবনা

বাক্য এবং তার গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া অন্বয় বা বাক্যতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজি 'Syntax' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'অন্বয়' বা বাক্যতত্ত্ব। Syntax শব্দটি দুটি উপাদানের মিলিত রূপ—syn, গ্রীক পূর্বসর্গ (preposition) sun-এর ল্যাটিন রূপ, যার অর্থ 'একত্রিত', এবং tax, গ্রীক ধাতু থেকে জাত, যার অর্থ 'নিয়ম মেনে বিন্যস্ত করা'। Syntax শব্দের অর্থ 'সুবিন্যস্তকরণ'। সংক্ষেপে অন্বয় বাক্যের ব্যাকরণ যা শব্দবিন্যাসের সূত্রগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে "Syntax is the way that words and phrases are put together to form sentences is a language." [New Oxford Advanced Learners' Dictionary of Current English, 7th edn. 2005] হলের মতে, "It is perhaps best to define syntax negatively, as the study of the combinations of such morphemes as are not bound on the levels of either inflection or derivation." এই সংজ্ঞা অনুসারে বাক্য শুধুমাত্র মুক্ত রূপকল্পের বিন্যাস নয়, আন্বয়িক উপাদানেরও সুবিন্যস্তকরণ।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বাক্যে পদসমষ্টির বিন্যাসের থেকেও বিভক্তির গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। যে কারণে বাক্যে পদক্রমের কোনোও বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না, বিভক্তির ব্যবহারই বাক্যে পদটি চিহ্নিত করতে সাহায্য করত যদিও পদক্রমের একটি সাধারণ নিয়ম ছিল, "The general rule is that the subject begins the sentence and the verb ends it, the remaining members coming between. ..... the verb occasionally moves to the beginning of the sentence when it is strongly emphasized ..... As regards the cases, the acc. is placed immediately before the verb ..... Adverbs and indeclinable participles occupy a similar position. Occasionally such words move to the beginning." [Modonell 1971 : 284] মধ্য ভারতীয় আর্যস্তরে বিভক্তি লোপের কারণে পদক্রমের গুরুত্ব ধীরে ধীরে অনুভূত হতে শুরু হল। এবং ওই স্তরের মাঝামাঝি সময় থেকে পদবিধির গুরুত্ব ভারতীয় আর্যভাষায় সম্পূর্ণই প্রতিষ্ঠিত হল।

বর্তমান এককে বাক্যের মধ্যে বিন্যস্ত উপাদানগুলি প্রথাগত ও সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হবে। প্রথাগত ধারায় বাক্যের প্রকৃতি নিরূপণে গঠন অপেক্ষা অর্থের গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। সাংগঠনিক ধারায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং বিন্যাসের সূত্রসমূহ আলোচিত হয় গঠনগত দিক থেকে। বাক্যে বিন্যস্ত উপাদানগুলি পর্যায়ক্রমিকভাবে ভাঙতে ভাঙতে চরমতম উপাদানে পৌঁছোনোর মধ্য দিয়েই উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়। প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাবিশ্লেষণের মধ্যে পার্থক্য থাকার কারণ পদ্ধতির বিন্যাস ও সূত্রের ভিন্নতর প্রয়োগ। বর্তমান এককে দুটি ধারায় বাক্যবিশ্লেষণের পদ্ধতিগত দিকগুলি আলোচনা করা হবে।

৩০২.৩.৯.৩ : ভাষাএকক বা বাক্য

বাক্যকে বৃহত্তম একক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। কেনেথ পাইক এবং এভলিন পাইক ১৯৮০ সালে তাঁদের Grammatical Analysis গ্রন্থে ভাষার বৃহত্তম একক হিসেবে কথোপকথন (Discourse)-কে সর্বোচ্চ একক হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলেছিলেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যে প্রদত্ত ধারণা স্পষ্ট হয় না যদি না অন্য আর একটি বাক্যের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। তবুও এখনও পর্যন্ত বাক্যকেই বৃহত্তম উপাদান হিসেবে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করা হয়।

এবার বুঝে নেওয়া যাক বাক্য কাকে বলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, "যে পদসমূহের দ্বারা কোনোও বিষয়ে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ যে পদগুলির দ্বারা বক্তা বা লেখক তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে, সেই পদসমষ্টিকে বলে বাক্য।" [চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৮৭] উল্লিখিত সংজ্ঞাটিতে ভাবগত দিকটি শুধুমাত্র উন্মোচিত, গঠনগত দিকটি কোনোও গুরুত্ব পাইনি। তাঁর সংশোধিত সংজ্ঞা আমরা পাই ১৯৭১-এ, "কোনোও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়।" [চট্টোপাধ্যায় ১৯৭১ : ২৮৪ দ্র: শ' ১৯৮৮ : ৪০২] Gardiner-এর মতে "A sentence is an utterance which makes just as long communication as the speaker intended to make before giving himself a rest." [Gardiner 1932] সংজ্ঞাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বক্তব্য এবং বাক্যের বির্তককে উসকে দেয়। বক্যের একটি পূর্ণ সংজ্ঞা বোধহয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে : "A sentence is a formula that sets forth the interelations of monemes and other grammatical elements, using certain functional-morphological schemata, couched in 'parts of speech' terms, which form the 'grammar of the language'. [Palmer 1978 : 98]" অর্থাৎ বাক্য হল একটা বিধি বা নিয়ম যা শব্দ এবং অন্যান্য ব্যাকরণিক উপাদানের পারসম্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে পদকে আশ্রয় করে। এখানে বাক্যের ভাবগত দিকটি 'moneme' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত। যখন আমরা 'part of speech' -এর কথা বলি তখন বাক্যের মধ্যে বিন্যস্ত শব্দগুলির বৈশিষ্ট্যই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাক্যের যেমন একটি বক্তব্যগত দিক আছে তেমনি গঠনগত

দিকটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাক্যকে আমরা 'শব্দ-শৃঙ্খল' হিসেবে দেখাতে পারি যেখানে শব্দের অর্থ, অবস্থান এবং ভূমিকা তিনটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

৩০২.৩.৯.৪ : প্রথানুসারী অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্য

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞায় (১৯৫৭) আমরা বাক্য চিহ্নিতকরণে ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণতাকেই গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি লক্ষ করেছি। Gardiner-এর সংজ্ঞাতেও আমরা বক্তার ইচ্ছা ও বক্তব্য নিরূপণে নৈয়ায়িকের দ্বারস্থ যতটা হয় গঠনবাদের দ্বারস্থ ততটা হয় না। প্রথানুসারি ব্যাকরণে বাক্যের সুদ্ধতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে যায়। যদিও আমরা জানি ভাষা, আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে ভাব বিনিময়ের যথার্থ মাধ্যম হিসেবে শুদ্ধতার প্রশ্নটি নাকচ করে। শুদ্ধতার প্রশ্ন তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং আসত্তি বা নৈকট্য। বাক্যের অর্থ অভিজ্ঞতা ও সুযুক্তির অনুসারি হওয়া চাই, অন্যথায় তা যথার্থ বাক্য হিসেবে গণ্য হয় না। 'অর্থগত বা ভাবগত সংগতি না থাকিলে, কতকগুলি পদকে ব্যাকরণ-অনুসারে পরস্পরের সহিত সংগত করিয়া বসাইলেই বাক্য হইবে না।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৯১) অর্থাৎ 'সে মাটিতে সাঁতার দিতেছে' বাক্যে শব্দের বিন্যাস ঠিক থাকলেও বাস্তবিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল না থাকার কারণে এটি বাক্য বলে বিবেচিত হবে না। অসম্পূর্ণ বাক্য অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যও বাক্য পদবাচ্য নয়, যেহেতু বাক্যটি শ্রোতার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটায় না। যেহেতু অসম্পূর্ণ বাক্য অর্থপূর্ণ করে না সেহেতু অসম্পূর্ণ বাক্য বাক্য হিসেবে বিবেচিত নয়। তৃতীয় সূত্র আসত্তি বা নৈকট্য পদবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। 'বাক্যের অর্থবোধের জন্য পদগুলিকে এমনভাবে সাজাইতে হয়, যাহাতে পরস্পরের সহিত অন্বিত পদ ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে পরপর প্রযুক্ত হয়—যাহাতে পদগুলির 'আসত্তি' বা 'নৈকট্য' রক্ষিত হয়।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৯২) ব্যাকরণগত সংগতি আসত্তির আওতাতেই পড়ে। কর্তার সঙ্গে ক্রিয়াপদের পক্ষবাচক (পুরুষবাচক) বিভক্তির সংগতি এই পর্যায়ভুক্ত।

৩০২.৩.৯.৫ : অনুশীলনী

১। প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্যগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

২। শুদ্ধ বাক্যের তিনটি সূত্র উদাহরণসহ স্পষ্ট করো।

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয়ের প্রসারক এবং সম্পূরক-এর ধারণাগুলি স্পষ্ট করো।

৪। খণ্ডবাক্য কাকে বলে? খণ্ডবাক্যের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৫। গঠন কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের গঠনের পরিচয় দাও।

৬। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত আলোচনা করো।

৭। বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের পার্থক্য বিশদ করো।

৩০২.৩.৯.৬ : গ্রন্থপঞ্জী

১. আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, ১৯৯৭ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ।

২. মহম্মদ দানীউল হক্, ১৯৯৩ ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন।

৩. রামেশ্বর শ, ১৯৯৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (১৯৭১) নবীন সং। কলকাতা : বাকসাহিত্য।

৬. L. R. Palmer. 1972 Descriptive and Comparative Linguistics A Critical Introduction. London : Faber Faber.

৭. Tarni Prasad, 2008 A Course is Linguistics. New Delhi : Prentice-Hall of India.

৮. A. A. Macdonell, 1975 A Vedic Grammar for Students. Delhi : Oxford University Press.

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক-১০

বাক্যের সংজ্ঞা ও গঠন, বিভিন্ন বাক্যের ধারণা, শুদ্ধ বাক্যের ত্রিসূত্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১০.১ : সাংগঠনিক অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্যের গঠন

৩০২.৩.১০.২ : গঠন—সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

৩০২.৩.১০.৩ : অনুশীলনী

৩০২.৩.১০.৪ : গ্রন্থপঞ্জী

৩০২.৩.১০.১ : সাংগঠনিক অন্বয়তত্ত্ব ও বাংলা বাক্যের গঠন

প্রথানুসারী ব্যাকরণের ঐতিহ্যাশ্রিত পথকে সরিয়ে রেখে জীবন্ত ভাষার মূর্তরূপকে 'যেমন দেখছি তেমন' আদর্শ অনুসরণে ভাষার গঠন বিশ্লেষণ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের মূল আদর্শ। সোসুর মূর্ত এবং বিমূর্ত রূপের কথা বলেছিলেন। বাক্যের উপাদানকে উল্লম্ব ও অনুভূমিক দুই দৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান এই দৃষ্টির অনুসারী। বাক্যকে একটি বৃহত্তর গঠন হিসেবে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত উপাদানে বিভাজন যেমন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তেমনি প্রতিবেশ অনুযায়ী বাক্যে শব্দের গঠন ও ভূমিকা চিহ্নিত করাও এই ধারার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পরবর্তী অংশে গঠন, গঠনের শ্রেণি, অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণের আদর্শ এবং শাব্দিক শ্রেণি আলোচিত হবে।

৩০২.৩.১০.২ : গঠন—সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

আংশিক বা সম্পূর্ণ অর্থবিশিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত শব্দসমষ্টিকে গঠন বলে। 'যদি সে আসে আমিও আসব' বাক্যটি কতকগুলি শব্দের সমষ্টি, নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং পূর্ণ অর্থ সমন্বিত। এটি একটি গঠন। আবার 'যদি সে যায়' খণ্ডবাক্যটি কয়েকটি শব্দের সমষ্টি, নিয়ম অনুযায়ী বিন্যস্ত কিন্তু অর্থ সম্পূর্ণ নয়। এটিও একটি গঠন অর্থাৎ অর্থপূর্ণ বা আংশিক যা-ই হোক না কেন শব্দগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে তাকে গঠন বলে চিহ্নিত করা হয়। 'ধেড়ে খোকা রাস্তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল' বাক্যটি যেমন একটি গঠন তেমনি 'ধেড়ে খোকা' এবং 'রাস্তায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল' এদুটিও গঠন। 'ধেড়ে' ও 'খোকা', মধ্যে বিন্যাসগত সম্পর্ক আছে এবং অর্থও আছে। গঠনের অন্তর্গত পদগুচ্ছ বা পদকে গঠনগত উপাদান বলে।

গঠনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়—অন্তঃকেন্দ্রিক ও বহিঃকেন্দ্রিক। গঠনের অন্তর্গত এক বা একাধিক উপাদানের সাহায্যে যদি গঠনটিকে প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে গঠনটিকে অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন বলে। অর্থাৎ গঠনের অন্তর্গত এক বা একাধিক উপাদান যদি সমগ্র গঠনটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে তাকে অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন বলা যাবে। প্রতিস্থাপক উপাদানটিকে 'শীর্ষ' এবং অন্য উপাদানগুলিকে 'বিশেষক' বলা হয়। 'ধেড়ে খোকা' পদগুচ্ছ 'খোকা' শীর্ষ এবং 'ধেড়ে' বিশেষক। যে অন্তঃকেন্দ্রিক গঠন শীর্ষ এবং বিশেষক যোগে গঠিত হয় তাকে **বিশেষিত** (অধীনতাজ্ঞাপক) **গঠন** এবং যে গঠনে বিশেষক থাকে না, অন্তর্গত শব্দগুলি সমপর্যায়ভুক্ত তাকে **সমানাধিকারজ্ঞাপক গঠন** বলে।

সমানাধিকারজ্ঞাপক গঠন সংযোগমূলক এবং সমগুরুত্ববাচক হতে পারে। সংযোগমূলক সমানাধিকারজ্ঞাপক গঠন সংযোজক 'ও' 'এবং' যোগে অথবা বিয়োজক 'অথবা' যোগে গঠিত হতে পারে। যেমন, 'রাম ও শ্যাম', 'লাল ও নীল' 'দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য', 'সাদা অথবা কালো' **সংযোগমূলক সমানাধিকার** গঠন। যদি গঠনে কোনো্ উপাদানটি শীর্ষ তা স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা না যায় সেই ধরনের গঠনকে সমগুরুত্ববাচক গঠন বলা হয়। 'রানি মেরি' গঠনে অর্থের দিক থেকে 'রানি মেরি' একধরনের রানি, একধরনের মেরি অথবা মেরি নামে রানি সবই সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে 'রানি' 'মেরি'-র বিশেষক এবং এটি একটি বিশেষিত গঠন মনে হলেও অস্পষ্টতার কারণে এই ধরনের গঠনকে সমগুরুত্ববাচক সমানাধিকারজ্ঞাপক গঠন বলে চিহ্নিত করা হয়। বাংলায় বিশেষিত গঠনে বিশেষক সবসময় শীর্ষের আগে বসে। যেমন—

ভালো ছেলে

বড় গাছ

আমার ভাই

পরবর্তী সংস্করণ

যে গঠনে অন্তর্গত উপাদানগুলির কোনো একটি বা একাধিক সদস্য সম্পূর্ণ গঠনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা না রাখে তাকে বহিঃকেন্দ্রিক গঠন বলে। 'সে রান্না করে' বাক্যে 'রান্না করে' গঠনটি অন্তর্গত উপাদানের কোনো একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় না। অর্থাৎ 'রান্না করে' গঠনের ব্যবহারিক স্বাধীনতা 'রান্না' অথবা 'করে' উপাদানের ব্যবহারিক স্বাধীনতার সমতুল নয়। 'রান্না করে' একটি বহিঃকেন্দ্রিক গঠন।

৩০২.৩.১০.৩: অনুশীলনী

১। প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্যগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

২। শুদ্ধ বাক্যের তিনটি সূত্র উদাহরণসহ স্পষ্ট করো।

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয়ের প্রসারক এবং সম্পূরক-এর ধারণাগুলি স্পষ্ট করো।

৪। খণ্ডবাক্য কাকে বলে? খণ্ডবাক্যের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৫। গঠন কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের গঠনের পরিচয় দাও।

৬। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত আলোচনা করো।

৭। বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের পার্থক্য বিশদ করো।

৩০২.৩.১০.৪ : গ্রন্থপঞ্জী

১. আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, ১৯৯৭ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ।

২. মহম্মদ দানীউল হক্, ১৯৯৩ ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন।

৩. রামেশ্বর শ, ১৯৯৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (১৯৭১) নবীন সং। কলকাতা : বাকসাহিত্য।

৬. L. R. Palmer. 1972 Descriptive and Comparative Linguistics A Critical Introduction. London : Faber Faber.

৭. Tarni Prasad, 2008 A Course is Linguistics. New Delhi : Prentice-Hall of India.

৮. A. A. Macdonell, 1975 A Vedic Grammar for Students. Delhi : Oxford University Press.

পর্যায় গ্রন্থ-৩

একক-১১

বাংলা পদক্রম

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১১.১ : বাংলা পদক্রম

৩০২.৩.১১.২ : অনুশীলনী

৩০২.৩.১১.৩ : গ্রন্থপঞ্জী

৩০২.৩.১১.১ : বাংলা পদক্রম

প্রথানুসারী ব্যাকরণে অন্বয় ঐতিহ্যের অনুসরণ বা পুনরাবৃত্তি বলা চলে। প্রাচ্যে, সংস্কৃত ধারার অনুসরণ কিংবা পাশ্চাত্যে রোমান ও গ্রীক ধারার অনুসরণ প্রথানুসারী ধারার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বাংলায় এই ধারা দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহমান থাকলেও সূত্রের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনা সাধিত হয়েছে। (মোরশেদ ১৯৯৭ : ৩০৫) বাংলা প্রথানুসারী ব্যাকরণের ধারায় সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব গৃহীত হওয়ায় বাংলা বাক্যগঠনের আলোচনা যৌক্তিক ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে

বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমান পাঠে প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুযায়ী বাংলা বাক্যের গঠনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে।

ক. উদ্দেশ্য ও বিধেয় সংগঠন : প্রথানুসারী ব্যাকরণে বাক্যের দুটি অংশ—উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার উদ্দেশ্যে বা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তা বিধেয়। উদ্দেশ্য এবং বিধেয় নিয়ে বাক্য গঠিত হয়। সমাপিকা ক্রিয়ার কর্তা উদ্দেশ্য এবং সমাপিকা ক্রিয়া নিজে বাক্যের বিধেয় অংশ। বাক্যস্থিত অন্যান্য পদ বা বাক্যাংশ হয় উদ্দেশ্য অথবা বিধেয়র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৮৮)।

খ. উদ্দেশ্য-প্রসারক ও বিধেয়-প্রসারক : বাক্যস্থিত যে সমস্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বাক্যের উদ্দেশ্যপদের বিশেষণ কিংবা বিশেষণস্থানীয় তা উদ্দেশ্য-প্রসারক হিসেবে গণ্য হয়, যেহেতু এই সমস্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ উদ্দেশ্যকে প্রসারিত করে। 'ভালো ছেলেরা পড়াশুনা করে' বাক্যে 'ভালো' উদ্দেশ্য পদ 'ছেলেরা'-কে প্রসারিত করে। তাই ভালো উদ্দশ্যের প্রসারক।

যে সমস্ত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিধেয়র আগে বসে বিধেয়কে প্রসারিত করে তা বিধেয়ের প্রসারক হিসেবে বিবেচিত হয়। 'ভালো ছেলেরা মন দিয়ে পড়াশুনা করে' বাক্যে 'মন দিয়ে' বিধেয় 'পড়াশুনা করে'-র প্রসারক। "বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষণ বা বিশেষণস্থানীয় পদ বা পদসমূহ (বা বাক্যাংশ), বিধেয়ক্রিয়ার সহিত অন্বিত কারক-পদ (কর্ম, সম্প্রদান ব্যতীত) এবং এই সমস্ত পদের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য পদ—এগুলি হইতেছে 'বিধেয়ের প্রসারক'। (চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৮৯)।

গ. সম্পূরক : যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিধেয়কে সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে সম্পূরক বলে। ক্রিয়াপদ অকর্মক হলে অর্থের পরিপূর্ণতার জন্য যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিধেয়কে 'পরিপূরিত' করে সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বিধেয়ের সম্পূরক বলে। 'ছেলেটি অসুস্থ ছিল' বাক্যে অর্থের পরিপূর্ণতার জন্য 'অসুস্থ' শব্দটি জরুরী। 'অসুস্থ' শব্দটি বিধেয়ের সম্পূরক।

ঘ. সকর্মক-অকর্মক ক্রিয়া : বিধেয় অংশের সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুইই হতে পারে। ক্রিয়াপদের আগে কর্ম থাকলে সেই ক্রিয়া সকর্মক ক্রিয়া। যেমন 'সে ভাত খেল' বাক্যে ক্রিয়া-সকর্মক। যে সমস্ত ক্রিয়া একাধিক কর্ম নিতে পারে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যে সমস্ত ক্রিয়াপদ কর্ম নেয় না তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন—সে যায়, সে আসে ইত্যাদি।

ঙ. প্রত্যক্ষ উক্তি-পরোক্ষ উক্তি : ভাষায় উক্তি দু-প্রকার—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। বক্তার কথার সরাসরি অনুবৃত্তি প্রত্যক্ষ উক্তি। যেমন—সে বলল, 'আমি যাব না।' বক্তার নিজস্ব উক্তি বাক্যে পরোক্ষভাবে প্রদত্ত হলে তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। যেমন—'সে বলল যে সে যাবে না।'

চ. বাক্য তিন প্রকার—সরল, জটিল এবং যৌগিক : একটিমাত্র বিধেয়ক্রিয়া নিয়ে গঠিত বাক্যকে সরল বাক্য বলে। সরল বাক্যে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়-প্রসারক থাকতে পারে এবং বিধেয় সম্পূরকও থাকতে পারে। একাধিক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট বাক্যও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকার কারণে সরল বাক্য বলে বিবেচিত হয়। 'রাম বনে গিয়েছিলেন' বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য এবং একটিমাত্র বিধেয়। কিন্তু 'রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ বনে গিয়েছিলেন' বাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য থাকলেও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকায় বাক্যটি সরল।

একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ডবাক্যের সহযোগে গঠিত বাক্য জটিল বাক্য। বাক্যের প্রধান বক্তব্য যে খণ্ডবাক্যে আধৃত সেটি প্রধান খণ্ডবাক্য। যে খণ্ডবাক্য অর্থের পরিপূর্ণতার জন্য অন্য বাক্যের উপর নির্ভর করে সেটি অধীনস্ত খণ্ডবাক্য। 'যে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে সে কখনও জীবনে উন্নতি করতে পারে না' বাক্যে দুটি খণ্ডবাক্য—'যে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে' এবং 'সে কখনও জীবনে উন্নতি করতে পারে না'। প্রথমটি অধীনস্ত খণ্ডবাক্য এবং দ্বিতীয়টি প্রধান খণ্ডবাক্য।

একাধিক প্রধান খণ্ডবাক্য সংযোজক অব্যয়ের সহযোগে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যগঠন করলে তাকে যৌগিক বা মিশ্র বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি বাক্যই স্বাধীন। যেমন—'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৭ : ৩৯৭) বাক্যে দুটি অংশই—'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে' এবং '(মানুষ) সৃষ্টি করে আনন্দে' প্রধান, মাঝে একটি ছেদ বা বিরাম থাকে যেটি সংযোজকের কাজ করে।

ছ. খণ্ডবাক্য : বৃহত্তর বাক্যের অন্তর্গত ছোট বাক্যিক একককে খণ্ডবাক্য বলে। বৃহত্তর গঠনকে (যেমন জটিল এবং যৌগিক বাক্য) একক হিসেবে চিহ্নিত করে খণ্ডবাক্য নির্ধারণ করা হয়। এই অর্থে একটি বিধেয় এবং এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত গঠনকে খণ্ডবাক্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যেহেতু তার বৃহত্তর এককে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। খণ্ডবাক্য স্বাধীন এবং অধীনস্ত দুই হতে পারে। স্বাধীন বা প্রধান বাক্যখণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অধীনস্ত খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যকে নির্ভর করে গড়ে উঠে।

গঠন অনুসারে খণ্ডবাক্য তিন প্রকার—সমাপিকা খণ্ডবাক্য, অসমাপিকা খণ্ডবাক্য এবং ক্রিয়াহীন। খণ্ডবাক্য। সমাপিকা খণ্ডবাক্য সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত। যেমন—'সে বই পড়ছে'। অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত খণ্ডবাক্য যেমন—'সে ভাত খেয়ে' অসমাপিকা খণ্ডবাক্য এবং ক্রিয়াপদহীন খণ্ডবাক্য, যেমন—'সে ভাল ছেলে' ক্রিয়াহীন খণ্ডবাক্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাক্যে খণ্ডবাক্যের ভূমিকা অনুসারে তিন প্রকার খণ্ডবাক্য পাওয়া যায়—বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য, বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য এবং ক্রিয়াবিষেণস্থানীয় খণ্ডবাক্য। যে খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য বলে। যেমন—'সে কহে বিস্তর মিছা, **যে কহে বিস্তর**'। প্রধান খণ্ডবাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়ার অবস্থা, প্রকৃতি নির্দেশ করে যে অধীনস্ত খণ্ডবাক্য তাকে ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য বলে। যেমন—'**যতদিন বাঁচবে** ততদিন জ্বালাবে।'

জ. পদক্রম : উদ্দেশ্য এবং বিধেয় দুটি অংশ নিয়ে বাক্য গঠিত হলেও উদ্দেশ্য বা বিধেয় উহ্য থাকতে পারে। উদ্দেশ্য বিধেয়র আগে বসে। উদ্দেশ্যর প্রসারক উদ্দেশ্যের আগে এবং বিধেয়র প্রসারক এবং সম্পূরক বিধেয়র আগে বসে। উদ্দেশ্য অংশে একাধিক কর্তার মধ্যে যদি প্রথম পক্ষের (উত্তম পুরুষ) কর্তা থাকে তাহলে ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। উদ্দেশ্য অংশে একাধিক কর্তা সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত হলে সাধারণত শেষের পদটিতেই বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন—'গুরু ও **শিষ্যের** একই গতি'। সংযোজকের দ্বারা যুক্ত না হলে প্রত্যেক পদে বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন—'**ধনে পুত্রে** লক্ষ্মীলাভ হোক'। পরোক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়ার কালের সংগতি থাকে না। যেমন—'সে বলল যে সে **আসবে না**'। নিত্য সম্বন্ধযুক্ত পদযুগলের একটি সদস্য ব্যবহৃত হলে এর অন্যটি ব্যবহৃত না হলে বাক্য অসম্পূর্ণ থাকে। যেমন— যে, যিনি, যাহা—সে, তিনি, তাহা।

৩০২.৩.১১.২: অনুশীলনী

১। প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্যগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

২। শুদ্ধ বাক্যের তিনটি সূত্র উদাহরণসহ স্পষ্ট করো।

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয়ের প্রসারক এবং সম্পূরক-এর ধারণাগুলি স্পষ্ট করো।

৪। খণ্ডবাক্য কাকে বলে? খণ্ডবাক্যের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৫। গঠন কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের গঠনের পরিচয় দাও।

৬। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত আলোচনা করো।

৭। বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের পার্থক্য বিশদ করো।

৩০২.৩.১১.৩ : গ্রন্থপঞ্জী

১. আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, ১৯৯৭ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ।

২. মহম্মদ দানীউল হক্, ১৯৯৩ ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন।

৩. রামেশ্বর শ, ১৯৯৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (১৯৭১) নবীন সং। কলকাতা : বাকসাহিত্য।

৬. L. R. Palmer. 1972 Descriptive and Comparative Linguistics A Critical Introduction. London : Faber Faber.

৭. Tarni Prasad, 2008 A Course is Linguistics. New Delhi : Prentice-Hall of India.

৮. A. A. Macdonell, 1975 A Vedic Grammar for Students. Delhi : Oxford University Press.

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ১২

অব্যবহিত ও চরম গঠনগত উপাদান

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৩.১২.১ : অব্যবহিত উপাদান ও চরম উপাদান

৩০২.৩.১২.২ : শাব্দিক শ্রেণি

৩০২.৩.১২.৩ : বাংলা ভাষার বাক্যিক উপাদান সংগঠন ও বৃক্ষচিত্র

৩০২.৩.১২.৪ : অনুশীলনী

৩০২.৩.১২.৫ : গ্রন্থপঞ্জী

৩০২.৩.১২.১ : অব্যবহিত উপাদান ও চরম উপাদান

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি বৃহত্তর গঠনকে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী স্তরে ভাগ করে উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক চিহ্নিত করা হয়। এই ধরনের বিভাজনকে **অব্যবহিত উপাদান** বিশ্লেষণ বলা হয়। এই ধরনের বিশ্লেষণে প্রতিটি গঠনকে দুটি ধারায় ভাগ করতে করতে একক উপাদানে পৌঁছোতে হয়। গঠনকে বিশ্লেষণ করে যখন শেষস্তরে অর্থাৎ শব্দে পৌঁছোনো যায় সেই স্তরকে **চরম উপাদান** বলে। 'ওই লম্বা কালো লোকটা হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিল' বাক্যটিকে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। বাক্সচিত্র এবং বৃক্ষচিত্র দুভাবেই বিশ্লেষণ সম্ভব।

বাক্সচিত্র ঃ ১

<table>
<tr><td colspan="8">ওই লম্বা কালো লোকটা হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিল</td></tr>
<tr><td colspan="5">ওই লম্বা কালো লোকটা</td><td colspan="3">হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিল</td></tr>
<tr><td>ওই</td><td colspan="3">লম্বা কালো লোকটা</td><td colspan="2">হেঁটে হেঁটে</td><td colspan="2">বাড়ি যাচ্ছিল</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">লম্বা কালো</td><td>লোকটা</td><td>হেঁটে</td><td>হেঁটে</td><td>বাড়ি</td><td>যাচ্ছিল</td></tr>
<tr><td></td><td>লম্বা</td><td>কালো</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

বৃক্ষচিত্র ঃ ১

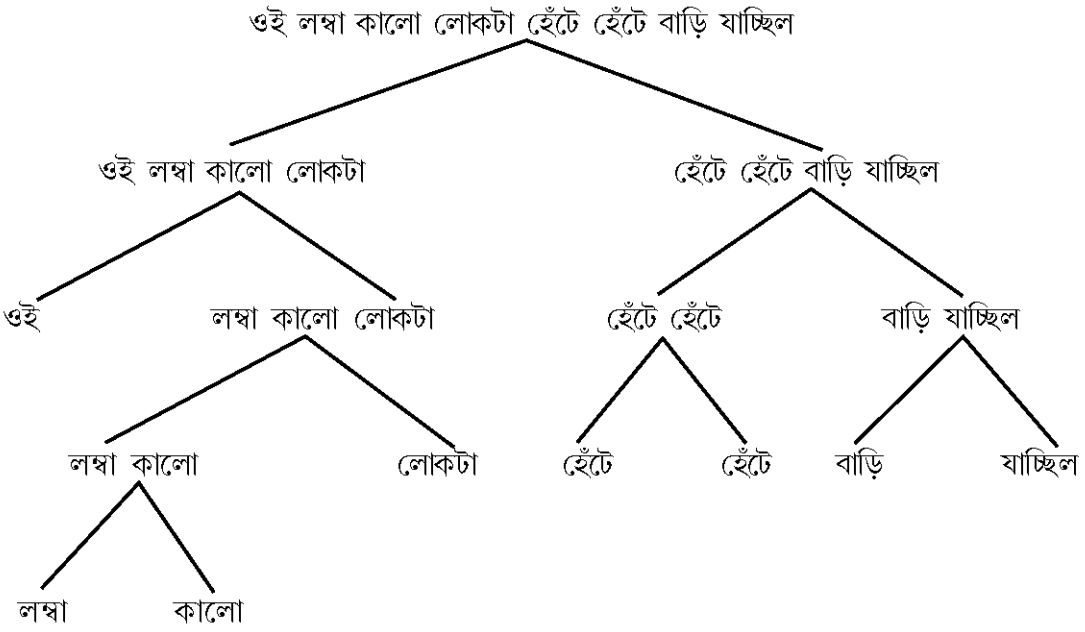

এই বিশ্লেষণে প্রতিটি স্তরে আমরা দুটি করে গঠনগত উপাদান পেয়েছি যেগুলি পূর্ববর্তী স্তরের অব্যবহিত উপাদান। শেষ স্তরে একক শব্দ যেগুলি পাওয়া গেল সেগুলি চরম উপাদানরূপে চিহ্নিত। বৃহত্তর গঠনকে গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করার কৌশল নির্ভর করে প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর। অর্থাৎ একাধিক শব্দযুক্ত একটি গঠনগত উপাদানকে যদি একটি শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায় তাহলে বোঝা যাবে গঠনের বিভাজন বা কর্তন ঠিক হয়েছে। বিষয়টি পরের চিত্রে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

বাক্সচিত্র ঃ ২

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লোকেরা যাকে তাকে অপমান করে		
দুর্মুখেরা	যাকে তাকে	অপমান করে
দুর্মুখেরা	অপমান	করে

এখানে অব্যবহিত উপাদান 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লোকেরা'-র জায়গায় যদি 'দুর্মুখেরা' প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে গঠনগত দিক থেকে বাক্সটির কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। একইভাবে দ্বিতীয় অব্যবহিত উপাদান 'যাকে তাকে অপমান করে'-র জায়গায় যদি 'অপমান করে' প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে বাক্যের গঠনে কোনো ব্যতয় ঘটে না।

উপরের বাক্সচিত্রে 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লোকেরা' অব্যবহিত উপাদানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অর্থাৎ 'লোকেরা' উপাদানের প্রসারকের কাজ করছে 'মানসিকভাবে' এবং 'বিপর্যস্ত শব্দ দুটি, প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী যা বিশেষণের কাজ করছে। আবার 'মানসিকভাবে' 'বিপর্যস্ত' শব্দটি বিশেষিত করছে। এই 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত লোকেরা' গঠনটিকে একটি পদগুচ্ছ বলে। আবার 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত'ও একটি পদগুচ্ছ কারণ 'বিপর্যস্ত' এবং 'মানসিকভাবে' পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

৩০২.৩.১২.২ : শাব্দিক শ্রেণি

গঠনগত উপাদান এবং বাক্যে অবস্থানের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে শাব্দিক শ্রেণি চিহ্নিত হয়। কোন্ ধরনের শব্দ, কোন্ ধরনের প্রত্যয় বা বিভক্তি নিতে পারে তার ওপর নির্ভর করে যেমন শব্দের শ্রেণি চিহ্নিত হয় তেমনই বাক্যে কোন্ জায়গায় শব্দটির বসার যোগ্যতা আছে তার উপর নির্ভর করেও শব্দের শ্রেণি চিহ্নিত হতে পারে। যেমন—'সততা' শব্দটি সম্বন্ধবাচক বিভক্তি {র~এর} যেমন নিতে পারে (সততার) তেমনই শব্দটি বাক্যে প্রারম্ভিক অবস্থানে উদ্দেশ্য হিসেবে (সততা মানুষের ধর্ম) এবং ক্রিয়াপদের আগে কর্ম হিসেবে বসতে পারে (সকলের সততা বজায় রাখা উচিত)। যে ধরনের শব্দ এই রকম বিভক্তি নিতে পারে এবং সম প্রতিবেশে ব্যবহৃত হয় সেই শব্দগুলিকে একই শ্রেণিভুক্ত শব্দ, এখানে **বিশেষ্য** বলে চিহ্নিত করা যায়।

শাব্দিক শ্রেণি এমনভাবে গঠিত হয় যদি একটি শ্রেণির কয়েকটি সদস্য দ্বিতীয় আর একটি শ্রেণির সদস্যদের সঙ্গে বসে তাহলে প্রথম শ্রেণির যে-কোনোও সদস্য দ্বিতীয় শ্রেণির যে-কোনোও সদস্যের সঙ্গে বসতে পারে।

৩০২.৩.১২.৩ : বাংলা ভাষার বাক্যিক উপাদান সংগঠন ও বৃক্ষচিত্র

সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যিক উপাদান গঠনগত ছক অনুসারে বৃক্ষচিত্রে অঙ্কিত হয়। তাই একে 'বাক্যাংশ গঠনবৃক্ষ' বলা হয়ে থাকে। 'নেড়ি কুকুরগুলো লোককে কামড়াতে পারে' জাতীয় বাক্যকে খুব সহজে ব্যাংক্যাংশে বিশ্লেষণ করা যায়।

বৃক্ষচিত্র ঃ ২

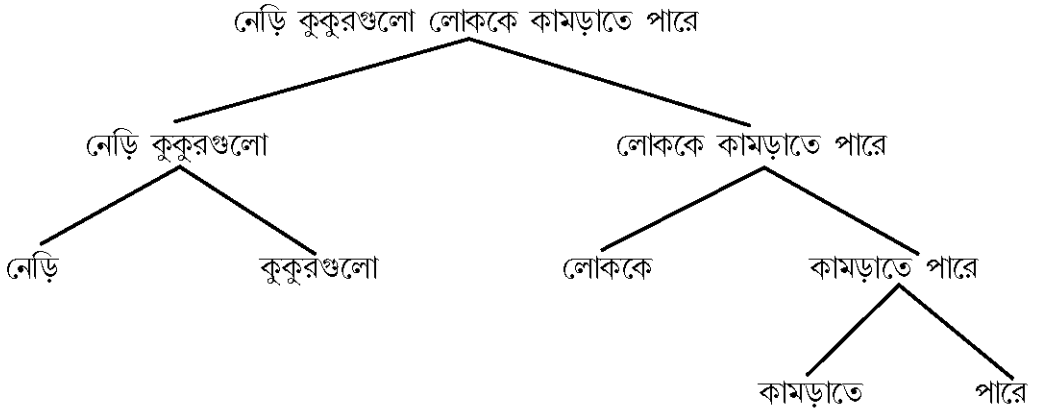

এই সংগঠন থেকে বোঝা যায় সবার উপরে থাকে মৌলিক বাক্য আর নীচের দিকে পর্যায়ক্রমে বাক্যের উপাদানগুলো অবস্থান করে। উন্নিত উপাদানগুলোই এক একটি গ্রন্থিতে অবস্থান করে। প্রতিটি গ্রন্থিতে একটি প্রতীক বসিয়ে দিলে বাক্যটির গঠন বুঝতে সুবিধে হয়। প্রতীক-সূত্র অনুযায়ী বাক্যটির বিশ্লেষণ এভাবে হতে পারে :

বৃক্ষচিত্র ঃ ৩

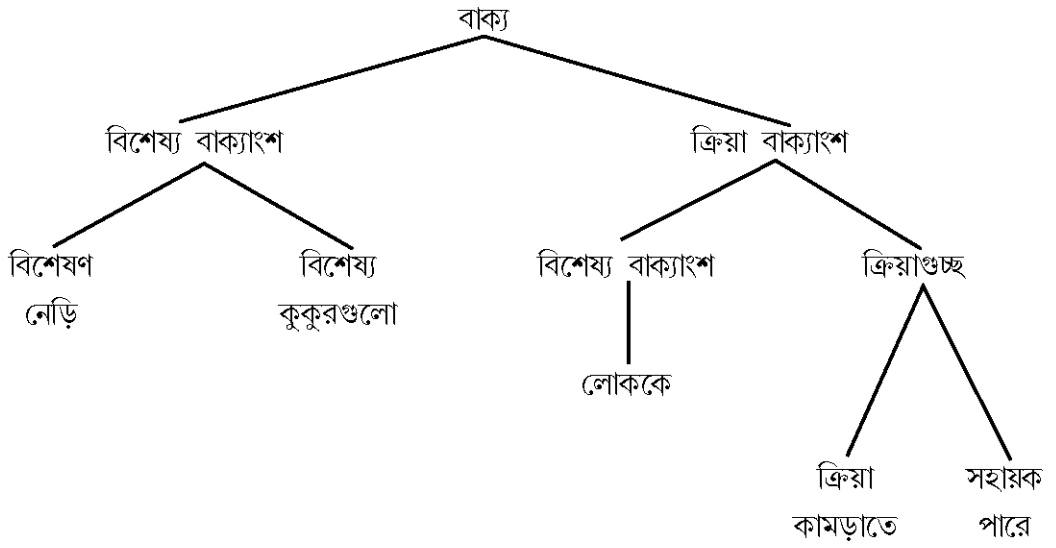

এই ধরনের চিত্রকে দানীউল হক 'বাক্যাংশ চিহ্নায়ক' এবং হুমায়ুন আজাদ 'পদচিত্র' বলেছেন। পুনর্লিখন সূত্রের সাহায্যেও বাক্যের গঠন দেখানো যেতে পারে ঃ

বা (বাক্য) → বি (বিশেষ্য) অংশ + ক্রি (ক্রিয়া) অংশ

অর্থাৎ 'নেড়ি কুকুরগুলো লোককে কামড়াতে পারে' প্রাথমিকভাবে দুটি অংশে বিভক্ত—'নেড়ি কুকুরগুলো', এখানে বি. অংশ আর 'লোককে কামড়াতে পারে'—বিণ. (বিশেষণ), এখানে 'নেড়ি' এবং বি. (বিশেষ্য), এখানে 'কুকুরগুলো'। ক্রি. অংশ বি. এবং ক্রি. যোগে গঠিত। বি. অংশ একটি উপদান নিয়ে গঠিত—বি., এখানে 'লোককে'। ক্রি. অংশে অবস্থান করে ক্রিয়াগুচ্ছ—ক্রি., এখানে 'কামড়াতে', এবং সহায়ক ক্রিয়া 'পারে'। পুনর্লিখন সূত্রের সুবিধা হল একটি বাক্যের গঠন অনুমানের ওপর নির্ভর না করে গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্দেশ করা যায়।

৩০২.৩.১২.৪: অনুশীলনী

১। প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে বাংলা বাক্যগঠনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করো।

২। শুদ্ধ বাক্যের তিনটি সূত্র উদাহরণসহ স্পষ্ট করো।

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক, বিধেয়ের প্রসারক এবং সম্পূরক-এর ধারণাগুলি স্পষ্ট করো।

৪। খণ্ডবাক্য কাকে বলে? খণ্ডবাক্যের বিভিন্ন ধরনের উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৫। গঠন কাকে বলে? বিভিন্ন ধরনের গঠনের পরিচয় দাও।

৬। অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত আলোচনা করো।

৭। বাক্যাংশ ও খণ্ডবাক্যের পার্থক্য বিশদ করো।

৩০২.৩.১২.৫: গ্রন্থপঞ্জী

১. আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, ১৯৯৭ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ।

২. মহম্মদ দানীউল হক্, ১৯৯৩ ভাষার কথা : ভাষাবিজ্ঞান। ঢাকা : করিম বুক কর্পোরেশন।

৩. রামেশ্বর শ, ১৯৯৮ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা। কলকাতা : পুস্তক বিপণি।

৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৫৭ সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৫. সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। (১৯৭১) নবীন সং। কলকাতা : বাকসাহিত্য।

৬. L. R. Palmer. 1972 Descriptive and Comparative Linguistics A Critical Introduction. London : Faber Faber.

৭. Tarni Prasad, 2008 A Course is Linguistics. New Delhi : Prentice-Hall of India.

৮. A. A. Macdonell, 1975 A Vedic Grammar for Students. Delhi : Oxford University Press.

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

চমস্কি ব্যাকরণের ধারা

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৩.১ : নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

৩০২.৪.১৩.২ : অব্যাহতি উপাদান

৩০২.৪.১৩.৩ : সাধারণ বাক্য

৩০২.৪.১৩.৪ : নোয়াম চমস্কিও সঞ্জননী ব্যাকরণ

৩০২.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.৪.১৩.১ : নোয়াম চমস্কির সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা অন্বয়তত্ত্ব

পৃথিবীর প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। শিশু যেমন বড় হতে হতে তার চারপাশের লোকজনদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মাতৃভাষা শিখে ফেলে তেমনিভাবেই যখন আমরা বড় হয়ে দেখি ব্যাকরণ না শিখেই আমরা ভাষার ব্যাকরণ মোটামুটিভাবে ব্যবহার করতে পারছি—তখন অবাক হয়ে যাই বই কি। কিন্তু আবার হবার ব্যাপার নয়। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি (Noam Abraham Chomsky) জানিয়েছেন আমাদের মাথার মধ্যে রয়েছে ভাষা শেখার কৌশল (Language Acquistion Devise)। একে সংক্ষেপে LAD বলে। এরই ফলে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাষা শিখতে থাকি। স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুচিকিৎসকগণ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত ভাষা এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। কান দিয়ে শোনার অনুভূতি—দেখার অনুভূতির পাশাপাশি রয়েছে কানে শোনার মনস্তত্ত্ব—চোখে দেখার মনস্তত্ত্ব। এগুলির সঙ্গে ভাষার অর্থাৎ কথা বলা ও লেখার কেন্দ্রগুলি যুক্ত হয়। আমাদের বাগ্‌যন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে স্নায়ু। আমরা কথা বলি।

কথা বলাই ভাষার ব্যবহার। এই ভাষার সবচেয়ে বড় একক (Unit) হল—বাচন (Discourse)। একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বা কোনো একটি প্রসঙ্গকে ধরে তৈরি হয় বাচন। বাচনকে বিশ্লেষণ করলে পাই বাক্য (Sentence)। প্রথানুসারী (Traditional) ব্যাকরণে বাক্য বলতে যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা-আসক্তিযুক্ত পদসমষ্টিকে বোঝায়। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাকরণেও পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। এই বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে পদগুচ্ছ (Phrase)। কোনো একটি প্রধান পদকে অবলম্বন করে এক বা একাধিক পদের সমষ্টি তৈরি করে পদগুচ্ছ। পদগুচ্ছ আর বাক্যখণ্ড (Clause) এক নয়। একটি সরল (Simple) বাক্য আর একটি বাক্যখণ্ড গঠনগত বিচারে একই। পদগুচ্ছকে বিশ্লেষণ করলে পাবো পদ (Grammatical Word)। সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হয়েছে 'সুপ-তিঙন্তং পদম্'। অর্থাৎ শব্দবিভক্তি (সুপ্) ও ক্রিয়াবিভক্তি (তিঙ্) যুক্ত শব্দ-ই হল পদ। যে শব্দ (Word) বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত হবার যোগ্যতা রাখে তাকেই পদ বলা হয়। একটি পদ এক বা একের বেশি রূপ (Morph) জুড়ে তৈরি হয়। রূপগুলি তৈরি হয় এক বা একাধিক স্বনিম (Phoneml) জুড়ে। সাধারণত স্বনিম-ই ক্ষুদ্রতম একক। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে স্বনিমের চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক আছে। এক বা একাধিক স্ব-লক্ষণ (Distinctive Features) যুক্ত হয়ে স্বনিম গঠিত হয়। বৈয়াকরণগণ ভাষা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এইসব নানাবিধ গঠনের কথা বলেছেন। এখানে আমরা অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনার বাক্যকে সবচেয়ে বড় একক হিসেবে ধরে গঠনগত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ব্যাকরণগত বড় একক বাচন নয়, বাক্য-ই।

প্রথানুসারী ব্যাকরণে একটি বাক্যকে উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate) এই দুভাগে ভাগ করা হত। যেভাবে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ করা হত সেখানে গঠনগত বিন্যাসের অসুবিধা বিশেষভাবে দেখা যেত। যেমন, 'আমি তোমাকে ডাকলাম' এই বাক্যে যেমন সহজে উদ্দেশ্য-আমি এবং বিধেয়-তোমাকে

ডাকলাম ভাগ করা যায় তেমন সহজে 'আজ আর ওখানে সে যাবে না'—কে ভাগ করা যায় না। এখানে 'সে' উদ্দেশ্য হলে তার আগে কিছুটা অংশ বিধেয় এবং পরেও বিধেয় কিছুটা অংশ জুড়ে রয়েছে। ফলে, উদ্দেশ্য-বিধেয় সংগঠন বক্তব্যধর্মী, গঠনধর্মী নয়।

৩০২.৪.১৩.২ : অব্যাহতি উপাদান

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ছোট ছোট এলাকায় আন্বয়িক সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইভাবে তাঁরা দুটি করে উপাদান যুক্ত করে অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের (Immediate Constitution Structure) কথা বলেন। অব্যবহিত উপাদান সংগঠনের ক্ষেত্রে দুটি করে উপাদান যুক্ত হয়ে ক্রমোচ্চ স্তর নির্মাণ করতে করতে বাক্যস্তরে উপনীত হয়। প্রথমে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বোঝানো যাক।

'আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না'—এই বাক্যে 'যাব'-র সঙ্গে 'না' এবং 'তাদের' ও 'সঙ্গে'-র অন্বয়িক সম্পর্ক ঘনিষ্ট। ফলে উপাদান দুটি যুক্ত হয়ে একটি করে উপাদানে পরিণত হবে। যথা—'যাব না' ও 'তাদের সঙ্গে'। এবার এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে তৈরি করবে 'তাদের সঙ্গে যাব না'—এই একটি উপাদান। এর সঙ্গে 'আজ' যুক্ত হয়ে 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না, এই একটি উপাদানে পরিণত হবে। এরপর, 'আমি' ও 'আজ তাদের সঙ্গে যাব না,—এই দুটি উপাদান যুক্ত হয়ে একটি উপাদানে পরিণত হবে। এইভাবে পদস্তর থেকে ক্রমোচ্চ স্তর গঠন করতে করতে সর্বোচ্চ স্তর—বাক্যে উপনীত হতে হবে। একেই অব্যহতি উপাদান গঠন বলে। যেভাবে এই অব্যহতি উপাদান দেখানো হয় তা এখানে দেখানো হল—

আমি	আজ		তাদের	সঙ্গে	যাব	না	* স্তর ১
আমি	আজ		তাদের সঙ্গে		যাব না		* স্তর ২
আমি	আজ	তাদের সঙ্গে যাব না					* স্তর ৩
আমি	আজ তাদের সঙ্গে যাব না						* স্তর ৪
আমি আজ তাদের সঙ্গে যাব না							* স্তর ৫

এখানে সমান্তরালভাবে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের পাশাপাশি সম্পর্ক হল—অব্যবহিত সম্পর্ক। আবার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে পরবর্তী স্তরের সম্পর্ক অব্যবহিত সম্পর্ক। স্তর-২ যেমন স্তর-১ এর অব্যবহিত পরবর্তী স্তর তেমনি তা স্তর-৩ এর অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর। কেবল স্তর-১ এর সঙ্গে স্তর-৫ এর সম্পর্ক চূড়ান্ত উপাদান সংগঠন সম্পর্ক (Ultimate Constitute Construction)। দুটি করে উপাদান এইভাবে যুক্ত হয়ে অব্যবহিত উপাদান সংগঠন তৈরি করছে।

একই স্তরের দুটি উপাদান বা তার চেয়ে বেশি উপাদান একই সঙ্গে অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। যেমন, 'কাগজ-বই-খাতা-কলম' এগুলি একই স্তরের উপাদান। এগুলি একই সঙ্গে একটি উপাদানের মতো ভূমিকা নেবে। আন্বয়িক গঠন তৈরি করবে একই সঙ্গে। অন্য একটি উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন—

ক.

সে	কাগজ	বই	খাতা	কলম	কিনল
সে	কাগজ বই খাতা কলম কিনল				
সে কাগজ বই খাতা কলম কিনল					

সংযোজক অব্যয়, ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাঁকানো রেখা দিয়ে সংযুক্তি দেখানোর কথা হকেট (Hockett) বলেন।

খ.

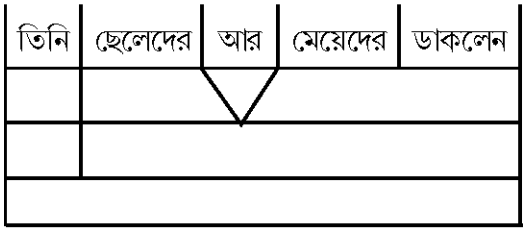

দ্ব্যর্থ বোধকতা অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। হকেট একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'Stout major's wife'-এই বাক্যে কে 'stout'? 'major's wife' কে? সমাধান সূত্র হিসেবে বলেছেন যেখানে শ্বাসাঘাত জোরে পড়ছে সেখানেই এই অর্থবোধের সূত্র পাওয়া যাবে। যদি 'Stout'-এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়ে তবে 'major's wife' কে 'stout' বোঝাবে। আর 'Major' এর ওপর শ্বাসাঘাত পড়লে 'stout' বোঝাবে 'major' কে। বাংলা ভাষায় শ্বাসাঘাত প্রাধান্য পায় না। তাই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলির অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ে। 'বড়ো সুন্দর গোলাপ'—এই বাক্যে 'গোলাপ'-টি বড়ো বোঝাচ্ছে নাকি 'সুন্দর'-এর 'বিশেষণ' হিসেবে 'বড়ো' ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা যায় না। এখানে অব্যবহিত উপাদানে বিশ্লেষণ করার সময় দুটি সম্ভাবনাই প্রাধান্য পেতে পারে।

ক.

বড়ো	সুন্দর	গোলাপ

খ.

বড়ো	সুন্দর	গোলাপ

অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক গঠনগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি হতে থাকে। একই শ্রেণির পদগুলি কীভাবে পদগুচ্ছ তৈরি করে তা বোঝা যায়। বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাবিজ্ঞানীগণ এভাবেই বাক্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আন্বয়িক সম্পর্ক নির্ণয় করবার চেষ্টা করলেন। লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড (Leouard Blommfield), হকেট (Hockett), গ্লিসন (Gleason), কুইনে (Quine), হ্যারিস (Harris) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর ভাবনাচিন্তায় এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্লুমফিল্ডের ছাত্র

হিসেবে নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) এই বিশ্লেষণী পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম দিকে তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মতো গবেষণা আরম্ভ করলেও পরবর্তীকালে স্বতন্ত্রপথ নির্মাণ করেছিলেন। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। এখানে কিছু অব্যবহিত উপাদানের বিশ্লেষণ ও সংযুক্তিকরণ দেখানো যেতে পারে।

৩০২.৪.১৩.৩ : সাধারণ বাক্য

স্তর

১	তিনি	ওই	পোড়ো	বাড়িতে	কাল	কিম্বা	পরশু	সারারাত	ধরে	বড়ো	বড়ো	মশার	কামড়ে	রাত্রি	কাটিয়েছেন
২															
৩															
৪															
৫															
৬															

এই বিশাল বাক্যটি মাত্র ছ'টি স্তরে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, এমন বাক্য যদি পাওয়া যায় যেখানে বাক্যের আন্বয়িক সম্পর্ক ধরে ঠিকঠাক বিন্যাস লাভ করা যাবে না। তাহলে কি করা হবে সেখানে? যেমন, 'ওই পোড়ো বাড়িতে তিনি কাল যাবেন'—এই বাক্যটি। এখানে বাক্যের মাঝখানে 'তিনি' পদটি অবস্থিত। সেখানে আন্বয়িক সম্পর্ক দেখানোর জন্য সংযোগসাধন করছে না এমন উপাদানকে পৃথক করে দেখানো যেতে পারে। যেমন—

স্তর

১	ওই	পোড়ো বাড়িতে	তিনি	কাল	যাবেন
২					
৩					
৪					
৫					

স্তর-৪ এর বিন্যাস স্পষ্ট হয়ে গেল 'তিনি' এই উপাদানকে বাদ রেখেই 'ওই পোড়ো বাড়িতে'— এই উপাদানটির সঙ্গে 'কাল যাবেন' উপাদানটি যুক্ত হচ্ছে। আবার 'তিনি' এই উপাদানটি 'ওই পোড়ো বাড়িতে কাল যাবেন' এই উপাদানটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্তর-৫ এ। এভাবেই অব্যবহিত উপাদানগুলি আন্বয়িক গঠনে যুক্ত হয়ে হয়ে একটি বড় গঠন তথা বাক্য নির্মাণ করে। অব্যবহিত উপাদানে সব বাক্য বিশ্লেষণে সম্ভব নয়। পরন্তু, মুখের ভাষা নিয়ে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীগণ কাজ করেছেন। মুখের ভাষায় জটিল গঠন সবসময়ে এই অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। আর এই কারণেই নোয়াম চমস্কি প্রবর্তিত সঞ্জননী ব্যাকরণের পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

৩০২.৪.১৩.৪ : নোয়াম চমস্কিও সঞ্জননী ব্যাকরণ

আমেরিকার ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কির জন্ম ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি মূলত ব্লুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান পদ্ধতি নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গঠনমূলক (Structural) ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। ভাষাবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং অঙ্ক ছিল তাঁর পাঠ্য বিষয়। তিনি একসময়ে আচরণবাদী (Behaviourist) ভাষাবিজ্ঞানীদের ভাবনাচিন্তা থেকে একটু আলাদা ভাবে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। ব্লুমফিল্ডের পথ থেকে সরে এলেন। বি. এফ. স্কিনার (B. F. Skinner)-এর 'Verbal Behaviour' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করলেন। এখান থেকেই বলা চলে তাঁর ভাবনাচিন্তা নতুন পথ অবলম্বন করেছে তা স্পষ্ট হয়ে যায় সকলের কাছে। ১৯৪১ থেকেই তিনি অবশ্য তাঁর নতুন পথে যাত্রা শুরু করেননি। এই সময়ে তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র হিসেবে হিব্রু ভাষার রূপ-স্বনিম তত্ত্ব (Morphophonemics of Modern Hebrew) নিয়ে কাজ করেছিলেন। অন্বয় নিয়ে ভাবনা শুরু হয় আর দুবছর পরে। ১৯৪৩-এ পত্রিকায় (Journal of Symbolic Logic, vol-18) আন্বয়িক বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞানের (Symolic Logic) পরিভাষা ও সূত্র প্রয়োগ করেন এই প্রবন্ধে (Systems of Syntactive Analysis)। ১৯৫৪-তে একাধিক প্রবন্ধ লিখলেন অন্বয় নিয়ে। এ টি গ্রন্থের রচয়িতাও তিনি। 'The Logical Structure of Linguistic Theory' (১৯৫৫)- এই মিমিয়োগ্রাফ গ্রন্থটি বেশি লোকের চোখে পড়েনি। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলে বোঝা গিয়েছিল যে সংবর্তনী ব্যাকরণের সূত্রপাত এই ১৯৫৫ থেকেই ঘটে গেছে। আসলে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Syntactic Structures' গ্রন্থটি তাঁর তত্ত্বকে বিশেষভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দেয়। ১৯৫৭-র 'Syntactic Structures' গ্রন্থে বাক্য বিশ্লেষণ করার তিনটি মডেল দিলেন। এই তিনটি মডেল আসলে তিন ধরনের ব্যাকরণ তৈরি করল।

ক. Finite State Grammar

খ. Phrase Structure Grammar

গ. Transformational Grammar

কীভাবে শব্দ জুড়ে জুড়ে আন্বয়িক গঠন তৈরি করা হয় সে বিষয়টি 'Finite State Grammar'-এর মডেলে রয়েছে। 'Phrase Structure Grammar'-এর মডেলটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেলের মধ্যে বাক্যগঠনের যে দিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে সেই দিকগুলি নিয়েই আন্বয়িক সূত্র নির্মিত হয়েছে। পরে ১৯৬৫-র তত্ত্বে 'Phrase Structure'-এর ব্যাকরণকে একটু পরিবর্তন করে 'Phrase Structure Rule' [PSR] হিসেবে দেখেছেন। 'Transformational Grammar'-এর ক্ষেত্রে যে নূতনত্ব দেখালেন তিনি তা সকলের কাছে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করেছিল। চমস্কির ১৯৫৭-র এই গ্রন্থটির তত্ত্ব ১৯৫৭-র তত্ত্ব হিসেবে প্রচার লাভ করে। পরে ১৯৫৭-র তত্ত্বকে নানাভাবে পরিমার্জিত করে ১৯৬৫-তে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির তত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের (Generative Grammar) মান্যতত্ত্ব বা Standard Theory বা সংক্ষেপে ST হিসেবে পরিচিত।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন, 'Language and Mind' গ্রন্থটি। মনোভাষাবিজ্ঞানের (Psycholinguistics) আলোচনায় এই গ্রন্থটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চমস্কির মান্যতত্ত্ব পরবর্তীকালে নানাভাবে সমালোচিত হয়। তিনি নিজেই এর নানা পরিবর্তন করতে থাকেন। সত্তর দশকের মাঝামাঝি এই তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করে Extended Standard Theory বা EST তৈরি করেন। ১৯৮১-তে প্রকাশ করেন 'Lectures on Government and Binding' গ্রন্থটি। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ রূপ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। এখানে সঞ্জননী তত্ত্বের 'Principal and Parameter' বা 'P & P' তত্ত্ব হিসেবে দেখলেন। তৈরি হল 'Revised Extended Standard Theory' বা REST তত্ত্ব। এখানে তিনি বৈশ্বিক ব্যাকরণের (Universal Grammar) সূত্র নির্মাণ করলেন।

সঞ্জননী তত্ত্বের গোড়ার কথা হল—বাক্য তৈরি করা বা সৃষ্টি করা। ভাষাতত্ত্বের (Philology) কাজকর্ম চলেছিল লিখিত নিদর্শনের ওপর নির্ভর করে। ভাষাবিজ্ঞান (Linguistics) মূলত মুখের ভাষাকেই গুরুত্ব দেয়। আমরা যেভাবে ভাষা শিখি—ভাষা ব্যবহার করি তা আসলে বাক্য সঞ্জনন (Generation) করা। চমস্কি এই বাক্য সঞ্জননের কথা বললেন। বাক্যের দুটি গঠনের কথা বললেন। একটি হল আদর্শ গঠন, অন্যটি হল প্রকৃত গঠন। ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণের কাঠামোকে মেনে নিয়েই তৈরি হয় বাক্যের আন্বয়িক কাঠামো। এই কাঠামোকেই অধোগঠন (Deep Structure) নাম দিয়েছেন তিনি। সীমাবদ্ধ আন্বয়িক গঠন তৈরি করে অসংখ্য বাক্য। এই উচ্চারিত বাক্যগুলি হল অধিগঠন (Surface Structure)। অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তনগুলি ঘটে সেগুলিকে বলে সংবর্তন (Transformation)। এইভাবে তিনি তৈরি করলেন সঞ্জননী সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Generative Grammar)। একে সংক্ষেপে TG Grammar বলা হয়।

চর্মস্কি সঞ্জননী ব্যাকরণকে কতকগুলি নিয়মের পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন। 'Aspects of the Theory of Syntax' (1965) গ্রন্থে তিনি তিনটি প্রধান উপাদান শ্রেণির বিন্যাস কক্ষ আছে বলে জানিয়েছেন। আন্বয়িক কক্ষ ও ধ্বনিতত্ত্বগত কক্ষের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের কথা জানিয়েছেন।

"This system of rules can be analyzed into three major components of generative grammar : The syntactic, phonological and semantic components" [p-16]

১৯৫৭-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বলেননি। বিশেষ গুরুত্বও দেননি। পরবর্তীকালে ছাত্র ও সহকর্মীদের কথায় তিনি শব্দার্থতত্ত্বকে গুরুত্ব দেন। চমস্কি সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণের প্রক্রিয়ার কথা যেভাবে বলেছিলেন তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—

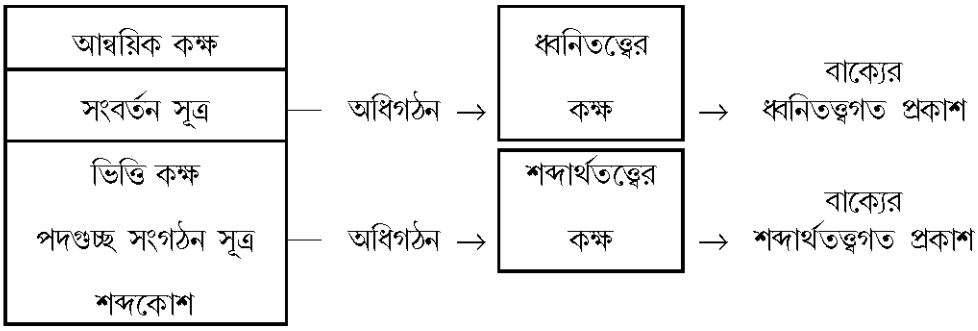

ভিত্তি কক্ষে (Base) রয়েছে দুটি বিষয়। একটি হল—শব্দকোশ (Lexicon)। এখান থেকে শব্দ নিয়ে তৈরি হয় বাক্য। পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র তৈরি করে একটি প্রাথমিক গঠন। এই কক্ষের সঙ্গে অধোগঠনের যোগ রয়েছে শব্দার্থতত্ত্বের কক্ষের সঙ্গে। সেখানে থেকেই বাক্যের অর্থবোধ ঘটে। অন্যদিকে সংবর্তন সূত্রের মাধ্যমে আন্বয়িক নিয়মাবলী আন্বয়িক কক্ষ থেকে যুক্ত হয়ে তৈরি করছে অধিগঠন। এই অধিগঠন ধ্বনিতত্ত্বের কক্ষের মাধ্যমে ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম যুক্ত হয়ে উচ্চারিত বাক্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। এইভাবে একদিকে অধোগঠন অন্যদিকে অধিগঠন একদিকে শব্দের বা বাক্যের অর্থবোধ অন্যদিকে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রকাশ নিয়ে বাক্যসঞ্জনন ক্রিয়া চলতে থাকে। একই নিয়মের দ্বারা তৈরি হতে থাকে অসংখ্য বাক্য।

৩০২.৪.১৩.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অব্যবহিত উপাদান কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে অব্যবহিত উপাদান গঠন-এর বিস্তারিত আলোচনা করো।

২। কীভাবে নোয়াম চমস্কি সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা আমাদের কাছে উপস্থাপন করলেন তা আলোচনা করো।

৩০২.৪.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৪

সংবর্ত ও সঞ্জননীর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, বীজ বাক্য

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব

৩০২.৪.১৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ

৩০২.৪.১৪.৩ : পারঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার

৩০২.৪.১৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য

৩০২.৪.১৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন

৩০২.৪.১৪.৬ : উপাদান শ্রেণি

৩০২.৪.১৪.৭ : ব্যাকরণ সম্মত সংবর্তন

৩০২.৪.১৪.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৪.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.৪.১৪.১ : সঞ্জননী ব্যাকরণ ও যুগ্মতত্ত্ব

নোয়াম চমস্কির সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি দুটি করে তত্ত্ব নিয়ে একটি তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। একটি তত্ত্ব আর একটির পরিপূরক। একে যুগ্মতত্ত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে। প্রধান চারটি যুগ্মতত্ত্ব তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যথা—

ক. বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar) ও বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)

খ. পারঙ্গমতাবোধ (Competence) ও ভাষা ব্যবহার (Performance)

গ. ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence) ও গ্রহণযোগ্য বাক্য (Acceptable Sentecne)

ঘ. অধোগঠন (Deep Structure) ও অধিগঠন (Surface Structure)

এক এক করে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল। মনে রাখতে হবে, এগুলি পরিপূরক যুগ্ম তত্ত্ব।

৩০২.৪.১৪.২ : বৈশ্বিক ব্যাকরণ—বিশেষ ব্যাকরণ

পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণ এক কী করে হতে পারে, এমন প্রশ্ন বহুবার উঠেছে। এইসব জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সহজ করে দেখা যাক বৈশ্বিক ব্যাকরণ (UG) বলতে কী বোঝায়। যে-কোনো ভাষারই রয়েছে অন্তর্গত গঠন। সেই গঠন বোঝা যায় বাক্যের উপাদান শ্রেণি বিশ্লেষণ করলে। যেমন, কোনো কিছুর নাম বোঝালে তা অবশ্যই নামপদ হবে। কাজ করা বোঝালে হবে ক্রিয়া। কোনো বস্তু বা বিষয়ের গুণ-দোষ ইত্যাদি বোঝালে হবে বিশেষক (modifier)। এইভাবে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া ইত্যাদি পদবিভাগ সব ভাষারই যেমন আছে তেমনি পদগুলির আন্বয়িক বিন্যাসও রয়েছে। যেমন বিশেষণ নামপদ বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হবে। আগে হতে পারে পরেও হতে পারে। যেমন, 'যাব না'—তে 'না' ক্রিয়া বিশেষণ ক্রিয়ার পরে বসেছে। 'জোরে যাবে'—তে ক্রিয়ার আগে বসেছে বিশেষণ। 'দেবী বিশালাক্ষ্মী'-তে বিশালাক্ষ্মী বিশেষণের ভূমিকা পালন করছে। আবার চমস্কি বৈশ্বিক ব্যাকরণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতিকে। ভাষা শেখার তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণা। পৃথিবীর সব ভাষাই একই পদ্ধতিতে শেখা হয়। একে বলা হয় LAD বা Language Acquisition Device অর্থাৎ, ভাষা গ্রহণের পদ্ধতি। ভাষার অভ্যন্তরীণ গঠন এই LAD-এর দ্বারাই আমরা শিখে যাই। আমাদের মাথার মধ্যে তৈরি হয় Language Faculty বা ভাষার এলাকা। 1972 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Language and Mind' গ্রন্থে চমস্কি এই ধারণা বিশেষভাবে ব্যক্ত করেছেন। বৈশ্বিক ভাষা বা বৈশ্বিক ব্যাকরণ বিষয়ক ধারণা মানুষের সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত। 1986-তে প্রকাশিত 'Knowledge of Language : Its Nature, Origin and Use' গ্রন্থে তিনি জানান, আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ভাষা শেখার শক্তিই বৈশ্বিক ব্যাকরণের ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ সংজ্ঞার মধ্যে অবস্থিত ভাষা বিষয়ক ধারণাই হল বৈশ্বিক। একটি বিশেষ ভাষার সঙ্গে অন্য একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণের পার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু উভয় ভাষার ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলি এক। যেমন ধরা যাক, বাংলা ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে চিনা ভাষার ব্যাকরণের তফাৎ অনেক আছে। কিন্তু উভয় ব্যাকরণের গঠনগত ও বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল সূত্রগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীনতা লক্ষ করা যায়।

যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণ হল বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)। যেমন, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ, তামিল ভাষার ব্যাকরণ—এসবই আলাদা আলাদা ভাষার ঐতিহ্য বহন করে সেই ভাষার অন্তর্গত কাঠামোর ওপর নির্ভর করে রচিত। এগুলি এক একটি বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ হিসেবেই গ্রহণ করা হবে।

এককথায় বলতে গেলে, যে সব সূত্র পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেমন ভাষা শেখার পদ্ধতি, অধোগঠন (Deep Structure) সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা তা বৈশ্বিক ব্যাকরণের মূল এলাকা। আর এই বৈশ্বিক ব্যাকরণের সূত্র মেনে বিশেষভাবে বিশেষ শব্দভাণ্ডার, আন্বয়িক নিয়ম ও ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম দিয়ে তৈরি হয় বিশেষ ব্যাকরণ।

৩০২.৪.১৪.৩ : পারঙ্গমতাবোধ—ভাষা ব্যবহার

মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে অসীম সম্পদ। সেই মনের অতলে অবস্থিত ভাষা সম্পর্কিত যে সম্পদ রয়েছে তার ওপর আলো ফেলাই সঞ্জননী ব্যাকরণের মূল কাজ বলে মনে করেন চমস্কি। তিনি মনে করেন ভাষা হল মানুষের মনের দর্পণ। আমরা আমাদের পরিবেশ থেকে ভাষা শিখি। সে ভাষা মূলত মাতৃভাষা। তাই ব্যক্তির মনের মধ্যে তার মাতৃভাষা সম্পর্কিত যে ধারণা থাকে, মাতৃভাষার যে শব্দভাণ্ডার, যে গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে তাকে এককথায় পারঙ্গমতাবোধ (Competence) বলে। 1965-তে চমস্কি যে পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেন তার সঙ্গে ভাষা ব্যবহার (Performance) জড়িয়ে থাকে।

ভাষা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান বা ধারণা হল পারঙ্গমতাবোধ। কথা বলতে পারা, শুনে তা বুঝতে পারা ইত্যাদি ক্ষমতা হল—পারঙ্গমতাবোধ। আর কথা বলা বা শোনা হল ভাষা ব্যবহার। পারঙ্গমতাবোধ আর ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে এই সম্পর্ক আছে কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ভাষা ব্যবহার আর পারঙ্গমতাবোধ এক। আমাদের কথা বলার সময় অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারের সময় নানা রকমের বাধা চলে আসতে পারে। যেমন, কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে যেতে পারে। ঠিকমত গুছিয়ে বলতে না পারা—এলোমেলো বলা। বলতে বলতে ভুলে যাওয়া। ঠিকঠাক না বলা বা ভুল বলা। কোনো বিষয় বলতে গিয়ে মনোযোগ হারিয়ে ফেলা। হঠাৎ অন্য কোনো বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে কথার মাঝখানে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন। কথা বলার সময় তোতলামি করা-পেকগেলা-গলা শুকিয়ে যাওয়া-নার্ভাস হওয়া-ভুল উচ্চারণ করা ইত্যাদি বিষয়ও বাধার সৃষ্টি করে। তাই ভাষা ব্যবহারের ভিতর দিয়ে সরাসরি বক্তার পারঙ্গমতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না।

প্রকৃত ভাষা ব্যবহার হল আদর্শ বক্তা—শ্রোতার কথা বলা। সেখানে স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা থাকবে না। এলোমেলো বলা—ছড়িয়ে বলা থাকবে না। কথার মাঝখানে মনোযোগ বদলানো চলবে না। কোনো কিছু ভুল বলবে না। কোনো ধরনের বাক্-বিচ্যুতি ঘটবে না। আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে প্রকৃত পারঙ্গমতাবোধের সম্পর্ক তৈরি হয়। বলা বাহুল্য, আদর্শ ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে বাস্তবে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য থেকেই যায়।

অনেকে মনে করেন Saussure-এর Langue ও Parole-এর ধারণার সঙ্গে চমস্কির Competence-Performance-এর ধারণার মিল আছে। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। চমস্কি Humboldt-এর 'Underlying Competence, এর ধারণা থেকেই এই পারঙ্গমতাবোধের ধারণা পেয়েছেন। একথা চমস্কি নিজেই জানিয়েছেন তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থের ভূমিকায়। যে-কোনো ভাষার সঞ্জননী ব্যাকরণ আদর্শ

বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধকে বিশ্লেষণ করে দেখাবে। বক্তা-শ্রোতার ভাষা ব্যবহারকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করবে। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান কাজ হল—আদর্শ বক্তা-শ্রোতার পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণ।

দুধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা চমস্কি বলেছেন—(ক) Grammatical বা ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধ এবং খ. Pragmatic বা প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধ। ব্যাকরণ সম্পর্কিত পারঙ্গমতাবোধকে ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক (Linguistic) পারঙ্গমতাবোধ বলা হয়। সাধারণভাবে বক্তার স্বজ্ঞায় দুধরনের জ্ঞান কাজ করে। একটি হল—বাক্যটির গঠন ঠিক আছে কিনা তা দেখা। অন্যটি হল—বাক্যের গঠন সম্পর্কিত বোধ অর্থাৎ ধ্বনি ও ধ্বনিবিজ্ঞানের ধারণা, রূপ বিষয়ক ধারণা, আন্বয়িক গঠন সম্পর্কে ধারণা ও অর্থ বা শব্দার্থ সম্পর্কে ধারণা। সবার মধ্যে এই ধারণাগুলির সবকটিই অল্পবিস্তর থাকে।

সংযোগমূলক (Communicative) বা প্রয়োগমূলক (Pragnatic) পারঙ্গমতাবোধের কথা 1966 খ্রিস্টাব্দে Dell Hymes আমাদের কাছে জানান। তিনি বলেন, বক্তার বাক্য সঞ্জননের ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি লক্ষ করা প্রয়োজন। চমস্কি প্রয়োগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন, 'Today was a disaster'-এই বাক্যে যে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তা পূর্ববর্তী ধারণার উপর নির্ভর করে আছে। আগের তথ্য না জানলে এই বাক্যের অর্থ জানা সম্ভব হয় না। ফলে, বাক্যের ব্যবহারের দিকটি এখানে প্রাধান্য পায়।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের প্রধান তিনটি দিক জানা যায়।

ক. মৌখিক সঙ্কেত এবং মৌখিক নয় এমন সঙ্কেত। ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এই ধরনের পারঙ্গমতাবোধ।

খ. ঠিকমতো কথা বলা ও বিষয় অনুসারে কথা বলা। একে আদান-প্রদান বিষয়ক ক্ষমতা বলে।

গ. সমাজের গঠন ও তার নানা বৈশিষ্ট্য ঠিকমতো জেনে কথা বলা। একে সংস্কৃতি-বিষয়ক জ্ঞান বলে।

চমস্কি পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে একই আদর্শ ভাষার দিকটির কথা বলেন। সেখানে বৈশ্বিক ব্যাকরণ প্রাধান্য পায়। সংযোগমূলক পারঙ্গমতাবোধের ক্ষেত্রে ভাষাবৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ভাষা ব্যবহার চমস্কি বুঝিয়েছেন, '...the actual use of language in concrete situation' [Chomsky, Aspects of ther Theory of Syntax, page-4]। বক্তার কথা বলা আর শ্রোতার ভাষা-বোধ বা উপলব্ধি করা হল ভাষা ব্যবহার। গতানুগতিকভাবে মনে করা হয় যে, যতটা পারঙ্গমতাবোধ ততটাই ভাষা ব্যবহার করা হয় বা পারঙ্গমতাবোধ যতটা অনুমতি বা ছাড়পত্র দেবে ততটা পর্যন্ত ভাষা ব্যবহার করতে পারব আমরা। বর্তমানে এ ধারণা ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা নিয়ে

এর আগে আলোচনা করেছি আমরা। এখানে বলা যায়, ভাষাব্যবহার ব্যাকরণের বিচ্যুতি বা বিভিন্ন বাক্যের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। ভাষাব্যবহারের ভুল বা Performance error নানাভাবেই দেখা যায়। যেমন, Black bird-এর অর্থ দুরকম। যদি Black-এ শ্বাসাঘাত দিয়ে উচ্চারণ করা হয় তবে তা এক ধরনের বিশেষ পাখিকে বোঝাবে। যদি দুটি অংশকেই শ্বাসাঘাত পড়ে তবে তা কালো রঙের পাখিকে বোঝাবে। ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা নয়, তাদের এই ধারণা নাও থাকতে পারে। তবে তা পারঙ্গমতাবোধের বিষয়। কিন্তু পারঙ্গমতাবোধ থাকা সত্ত্বেও কথা বলার সময় ভুল উচ্চারণ যে-কোনো সময়েই হতে পারে।

আরো নানা ধরনের পারঙ্গমতাবোধের কথা বলেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ। যেমন, পাঠগত (Textual) পারঙ্গমতাবোধ, বাচনগত (Discourse) পারঙ্গমতাবোধ, বর্ণনা বা আখ্যান নির্মাণের (Narrative) পারঙ্গমতাবোধ, সাহিত্যিক (Literary) পারঙ্গমতাবোধ, ধারণাসম্পর্কিত বা জ্ঞান সম্পর্কিত (Cognitive) পারঙ্গমতাবোধ ইত্যাদি।

৩০২.৪.১৪.৪ : ব্যাকরণসম্মত বাক্য—গ্রহণযোগ্য বাক্য

যে বাক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি এবং মনে মনেই তার বিশ্লেষণ করতে পারি তাকেই চমস্কি গ্রহণযোগ্য বাক্য বলে মনে করেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য না লিখেই বিশ্লেষণ করা যায়। ব্যাকরণের নিয়ম মেনে যে বাক্য রচিত হয় তাকে ব্যাকরণসম্মত বাক্য বলে। পারঙ্গমতাবোধের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সম্পর্ক রয়েছে। পারঙ্গমতাবোধ নির্ণয়ের একটি মাপকাঠি হল বাক্যের বা ভাষার ব্যাকরণ মেনে চলা। ব্যাকরণসম্মত বাক্যের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য বাক্যের ধারণাকে মেলানো উচিত নয়। গ্রহণযোগ্য বাক্যের একটিমাত্র দিক হল ব্যাকরণ মেনে চলা। কিন্তু এছাড়াও অন্য নানা দিক আছে। ভাষাব্যবহার বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হল গ্রহণযোগ্যতা।

কোনো বাক্য আদর্শ বা ব্যাকরণের গঠন থেকে বিচ্যুতি হলেও তাকে গ্রহণযোগ্য বাক্য কেন বলব তা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে। যেমন, খুব তাড়াতাড়ি বললেও বোঝা যাবে এমন বাক্য, মনে রাখা সহজ হচ্ছে এমন বাক্য, স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হচ্ছে এমন বাক্য ইত্যাদি। সঞ্জননী ব্যাকরণের সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বাক্য চমস্কি গ্রহণ করতে চান না। যে বাক্যগুলি খুব সহজেই সঞ্জনিত হয় সেই বাক্যগুলিকেই গ্রহণযোগ্য বাক্য অর্থাৎ সূত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য বলে মনে করেছেন। গ্রহণযোগ্য বাক্য হতে গেলে যেমন খুব সহজেই সঞ্জনিত হতে হবে তেমনি খুব সহজেই বোঝা যাবে। স্বাভাবিক ও আয়তনে ছোট বাক্যই তাই ভাষা বিশ্লেষণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বাক্য।

৩০২.৪.১৪.৫ : অধোগঠন—অধিগঠন

আন্বয়িক উপাদান শ্রেণি দিয়ে প্রত্যেক বাক্যের ক্ষেত্রে একটি করে অধোগঠন (Deep Structure) ও একটি করে অধিগঠন তৈরি করে। বাক্যের আদর্শ গঠন তৈরি হয় অধোগঠনের মাধ্যমে। অধোগঠনে থাকবে ভিত্তি কক্ষ। সেখানে থাকবে শব্দশেষ আর পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র। আন্বয়িক কক্ষে থাকবে আন্বয়িক সূত্র এবং

সংবর্তন কক্ষে থাকবে সংবর্তন সূত্র। ১৯৫৭-তে শব্দার্থতত্ত্বের কথা চমস্কি বলেননি। ১৯৬৫-র তত্ত্বে তিনি শব্দার্থতত্ত্বের কথা বললেন। অধোগঠনেই বাক্যের অর্থবোধের দিকটি পরিচালিত হবে। অধোগঠন সংবর্তনের মাধ্যমে অধিগঠনে পরিণত হয়। অধিগঠনে বাক্যের ধ্বনিতত্ত্বগত (Phonological) প্রকাশ ঘটে। চমস্কি প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে এই দুটি গঠন দেখানো হল—

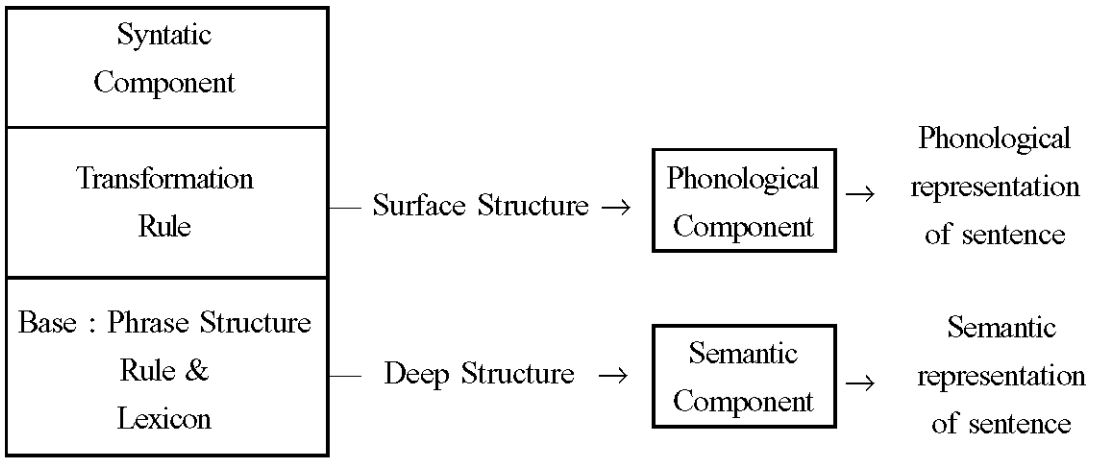

৩০২.৪.১৪.৬ : উপাদান শ্রেণি

সঞ্জননী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রথানুসারী ব্যাকরণ অনুসারে যে যে তথ্য লাভ করা যায় তা দেখা যেতে পারে চমস্কি মনে করেছিলেন [1965 : 128]। যেমন, 'Sincerity may frighten the boy' এই বাক্যটি সম্বন্ধে প্রথানুসারী ব্যাকরণে যে তথ্য পাওয়া যাবে তা অনেকটা এই ধরনের—

১. এই শব্দশৃঙ্খলটি একটি বাক্য = Sentence (S), 'frighten the boy' হল ক্রিয়াগুচ্ছ (Verb Phrase) = (VP), এতে ক্রিয়াপদ 'frighten' রয়েছে। ক্রিয়া = Verb (V), বিশেষগুচ্ছ = Noun Phrase (NP) হল 'the boy', 'Sincerity'-ও একটি বিশেষগুচ্ছ। বিশেষগুচ্ছ 'the boy'-তে নির্দেশক = Determiner (Det) হল 'the' ইত্যাদি।

এইসব তথ্য অবশ্যই বাক্যের গঠন বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বাক্যটির গঠন বিশ্লেষণ করলে তার বৃক্ষচিত্রটি এইরকম দাঁড়ায়—

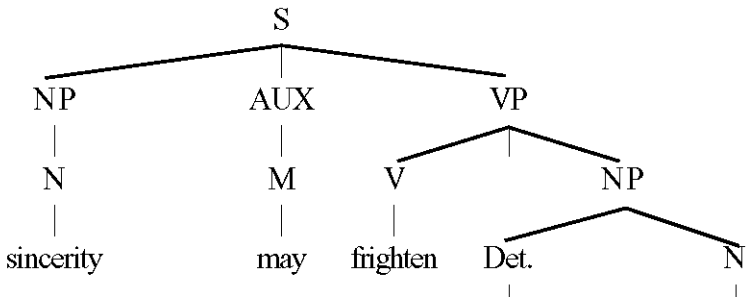

এই ধরনের পদগুচ্ছ বিশ্লেষণী ব্যাকরণে দুটি প্রধান চিহ্ন থাকে—একটি হল শব্দ প্রতীক (formatives) অন্যটি হল—শ্রেণি প্রতীক (Category symbols)। the, boy ইত্যাদি হল শব্দ প্রতীক আর S, NP ইত্যাদি হল—শ্রেণি প্রতীক। পুনর্লিখন সূত্রের মাধ্যমে এই বৃক্ষচিত্রটি এভাবে দেখানো যেতে পারে—

(i) S → NP Aux VP

VP → V NP

NP → Det N

NP → N

Det → the

Aux → M

(ii) M → may

N → sincerity

N → boy

V → frighten

এই সূত্র অনুসারেই বাক্যটি সঞ্জনিত হয়েছ। এই সূত্র ধরে অজস্র বাক্য সঞ্জনিত হতে পারে। S, NP, VP, AUX এই চারটি শ্রেণি হল Major Categories বা প্রধান উপাদান শ্রেণি। আর M, N, V ইত্যাদি হল Lexical Categories বা শব্দ শ্রেণি।

প্রথানুযায়ী ব্যাকরণের উদ্দেশ্য (Subject)—বিধেয় (Prdicate) বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে এই সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয় বলে চমস্কি জানিয়েছেন। Allen এবং Buren জানান—

> "The notion 'Subject', as distinct from the notion 'NP', designates a grammatical function rather than a grammatical category." [Chomsky : Selected Readings, p-45]

বাক্যে ব্যবহার অনুসারে পদভূমিকা অনুসারে উদ্দেশ্য-বিধেয় বিভাজন হয়। এই পদভূমিকার সঙ্গে শ্রেণি প্রতীককে এক করে দেখা সঙ্গত নয়।

৩০২.৪.১৪.৭ : ব্যাকরণ সম্মত সংবর্তন

অধোগঠন থেকে অধিগঠনে যাওয়ার সময় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে সংবর্তন। এই সংবর্তন দুধরনের হতে পারে। (১) একক (singulary) সংবর্তন। একটি পদগুচ্ছ সংগঠনের দ্বারা পরিচালতি হয় যে সংবর্তন তাকে একক সংবর্তন বলে। যেমন,

John kissed Mary → Mary was kissed by John

They will win → Will they win?

The problem was difficult → The problem wasn't difficult.

২. সাধারণীকৃত (generalized) সংবর্তন। একের বেশি পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি নতুন পদগুচ্ছ চিত্র নির্মাণ করে। যেমন,

The man stayed for supper
The man bought the house
} → The man who bought the house stayed for supper.

He said it
He was going
} → He said that he was going.

We have to work hard
It is a nuisance
} → Our having to work hard is a nuisance.

চমস্কি প্রদত্ত সংবর্তনগুলি চমস্কি প্রদর্শিত বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

প্রশ্ন সংবর্তন—

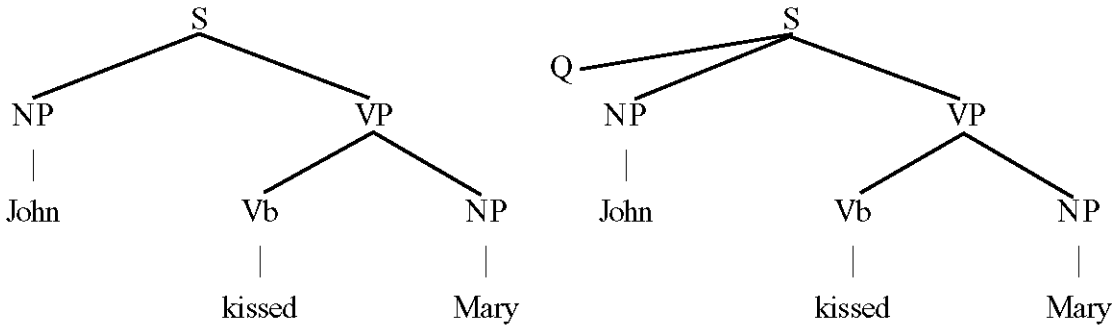

এখানে Q চিহ্ন থাকলে প্রশ্ন সংবর্তটি বাধ্যতামূলক সংবর্তন হবে। যদি Q চিহ্ন না থাকে তাহলে প্রশ্ন সংবর্তন ইচ্ছামূলক সংবর্তন হবে।

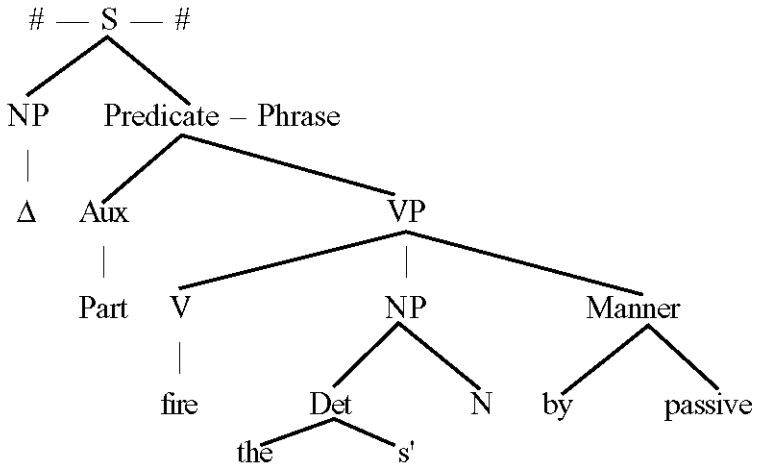

এই বৃক্ষচিত্রে s′ চিহ্ন থাকায় এর সঙ্গে আর একটি বৃক্ষচিত্র যুক্ত হবে।

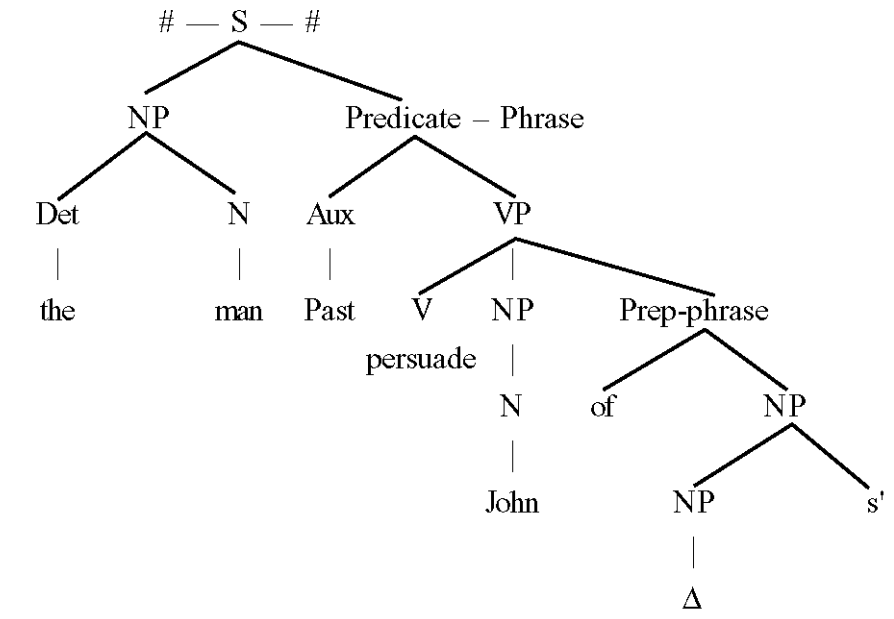

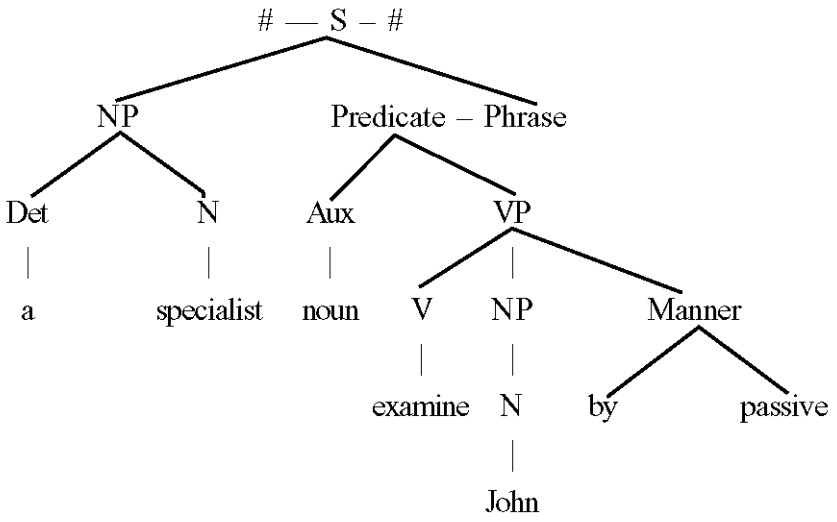

the man who persuaded John to be examined by a specialist was fired—এই বাক্যটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই তিনটি বৃক্ষচিত্র প্রয়োজন।

চমস্কি জানালেন,

"Thus the syntactic component consists of a base that generates deep structures and a transformational part that maps them into surface structures."

এভাবে আন্বয়িক কক্ষ থেকে অধোগঠন তৈরি হয়। সংবর্তন কক্ষ তাকে অধিগঠনে পরিণত করে।

বাক্যের অধোগঠন শব্দার্থতত্ত্ব কক্ষের মাধ্যমে অর্থবোধ ঘটায়। সঞ্জননী ব্যাকরণের কাজ হল শব্দার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের প্রকাশকে মিলিয়ে দেওয়া।

> "The final effect of a grammar, then, is to relate a semantic interpretation to a phonetic representation—that is, to state how a sentence is interpreted."—Chomsky 'Aspect of the theory of Syntax'.

৩০২.৪.১৪.৮ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সঞ্জননী ব্যাকরণের প্রধান সূত্রগুলি লেখো।

২। পারঙ্গমতাবোধ ও ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখো।

৩। উপাদানশ্রেণি বলতে চমস্কি কী বুঝিয়েছেন তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। ব্যাকরণসম্মত সংবর্তন নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৫। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) ভাষার একক (খ) সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণ (গ) বৈদ্ধিক ব্যাকরণ (ঘ) পারঙ্গমতাবোধ (ঙ) ব্যাকরণসম্মত বাক্য - গ্রহণযোগ্য বাক্য (চ) অধোগঠন - অধিগঠন (ছ) উপাদান শ্রেণি (জ) পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (ঝ) একক সংবর্তন (ঞ) সাধারণীকৃত সংবর্তন (ট) বৃক্ষচিত্র।

৩০২.৪.১৪.৯ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৫

চমস্কি পরবর্তী তত্ত্ব

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৫.১ : চমস্কি পরবর্তী তত্ত্ব

৩০২.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৫.১ : চমস্কি পরবর্তী তত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় আব্রাহাম নোয়াম চমস্কির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মূলত বিংশ শতাব্দীর ভাষাবিজ্ঞানী। তাই তাঁর চিন্তাভাবনায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। তিনি একদিকে ভাষা জিজ্ঞাসার আসল লক্ষ্য নিরূপণ করেন, অন্যদিকে ভাষার সৃজনী দিকের ওপরেও গুরুত্ব দেন।

চমস্কি ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে ইহুদী ছিলেন। শিক্ষাগ্রহণ করেন আমেরিকায়। কিন্তু তাঁর চিন্তাচেতনায় আমেরিকার প্রতি বিরূপ ভাব দেখা যায়। কারণ তিনি আমেরিকার মানবতা বিরোধী রাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন করেননি। তাঁর রচনা "American power and the New Mandarins" গ্রন্থটিই তার প্রমাণ। তিনি ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে যেসব গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হল—

1. Syntatic Structures (1957)
2. Current Issue in Linguitic Theory (1964)
3. Aspects of the Theory of Syntax (1965)
4. Topics in the Theory of Generative Grammar (1966)
5. Cartesian Linguistics : A chapter in the History of Rationali of Thought (1966)
6. Language and Mind (1968)

উল্লেখ্য চমস্কির পর থেকেই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়। তাঁর লেখা 'Syntactic Structures' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সম্পর্কে নতুন ভাবনার পরিচয় পান। 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে চমস্কির মতবাদ কিছুটা সংশোধিত হয়। তিনি মনে করেন, মানুষের ভাষার প্রকাশরূপের অন্তরে আছে যে অর্থসম্পদ, তার বাহ্যগঠনের তলে রয়েছে যে গভীরতর গঠন এবং বাহ্যব্যবহারের অন্তরে নিহিত আছে ভাবকেন্দ্র স্বরূপ যে মন, তাকে আবিষ্কার করাই হল ভাষাজিজ্ঞাসার আসল লক্ষ্য। আবার ভাষার সৃজনী দিকের (creative aspect) উপরে জোর দিয়ে 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছেন—

> "..... One of the qualities that all language have in their creative aspect. The grammar of a particular language then, is to be supplemented by a universal grammar that accomodates the creative aspect of language use".

সুতরাং আমরা মনে করি, ভাষার দুই রূপ—সাহিত্যের ভাষা ও মুখের ভাষা। দুইই ভাষাবিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থান পেতে পারে। চমস্কির 'Syntactic Structure' গ্রন্থ থেকেই Transformational and Generative Grammar' উদ্ভুত হয়েছিল। বাংলা ভাষায় ড. পবিত্র সরকার এরই প্রতিশব্দ করেছেন 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ'। 'Syntactic Structure' বইটিতে চমস্কি দেখিয়েছেন যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বাক্যই মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। তিনি মনে করেন বাক্যের চেহারা যেহেতু নানারকম হতে পারে, সেইজন্য বাক্যের process বা operation বা কার্যপদ্ধতি শেখানোই ভাষাবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

চমস্কির রূপান্তরী প্রজনন ব্যাকরণ শুরু হচ্ছে এই কথা থেকে বোঝা যায় সে সীমাবদ্ধ বাক্য উপাদান থেকে অগণিত বাক্যের সৃষ্টি বা generation কিভাবে হয়? বা বাক্যগঠনের নীতিগুলি সীমাবদ্ধ হলেও প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বাক্য তৈরি হচ্ছে কিভাবে? তার উত্তরে চমস্কি বলেন এটা সম্ভব হচ্ছে Transformation বা রূপান্তর বা সংবর্তনেরদ্বা। চমস্কির মতে ভাষায় Kernel Sentence বীজবাক্য থাকে। সংবর্তনের ফলে সেগুলি থেকে নতুন নতুন বাক্য সঞ্জনন করার যায়।

কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী যেমন—গ্লীসন, হকেট প্রমুখ চমস্কির মতবাদকে সরাসরি আক্রমণ করে নিজের মতবাত প্রচেষ্টার চেষ্টা করেন। কিন্তু দেশে-বিদেশে চমস্কির তত্ত্বের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। শুধু তাই নয় ভাষাবিজ্ঞানের সীমানা ছাড়িয়ে চিন্তাজগতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে চমস্কির দৃষ্টিভঙ্গি। চমস্কির মতবাদের এই ব্যাপক স্বীকৃতির কারণ ভাষাবিজ্ঞানে যুগগত চাহিদার সঙ্গে চমস্কির তত্ত্বের ইতিহাস নির্দিষ্ট সাদৃশ্য। ভাষাবিজ্ঞানের বিবর্তন ধারায় একটি বিশেষ সঙ্কটলগ্নে তিনি এমন একটি মতবাদ নিয়ে এলেন, যার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন যান্ত্রিক মতবাদে মানুষের সৃজনশীল চিত্ত যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, তখনই চমস্কি নিয়ে এসেছিলেন রূপান্তরমূলক, সৃজনমূলক ব্যাকরণের তত্ত্ব। যার প্রথম কথাই হল ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়, তা একটা সৃজনমূলক ব্যাপার। সেটা মানুষের সৃজনী চেতনার (creative consciousness) সঙ্গে যুক্ত।

ব্লুমফিল্ড গোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ যেখানে ভাষার বাহ্যগঠন অর্থাৎ দেহসত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাষার ভাগবত অর্থগত দিকটি উপেক্ষা করেছেন, সেখানে চমস্কি তার বিপরীত তত্ত্বের কথা বলেছেন। তিনি ভাষার সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ভাষার মনোগত দিকটিকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। এই জন্যই চমস্কির তত্ত্বকে মনস্তত্ত্ব প্রধান তত্ত্ব (Mentalistic Theory) বলে। ভাষা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সৃজনমূলক তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তিনি দেখেন ভাষা শুধুমাত্র যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন মানুষ যখন মাতৃভাষায় স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, তখন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তাকে বহুপ্রকারের বহু সংখ্যক বাক্য ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ সারাজীবনই তাকে অসংখ্য নতুন নতুন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে অসংখ্য নতুন বাক্য বলতে হয়। প্রশ্ন হল এত সব বাক্য কি মানুষ পৃথিবীতে জন্মাবার পরই পিতা-মাতা বা সমাজের কাছ থেকে শিখে রেখেছে? মানুষের মন কি সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কল্পনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য আগেই সমাজের কাছ থেকে শিখে নেয় টেপ রেকর্ডারের মতো। এবং ভাষাও কোনোরকম যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। মাতৃভাষাভাষী মানুষের মন ভাষার মূল নীতিটুকু নিজের সহজবোধ ও বোধির সাহায্যে আয়ত্ত্ব করে থাকে। তারপর সেই মূল নীতিটুকু প্রয়োগ করে ভাষার সীমাবদ্ধ উপকরণকে নিজের সৃজনী ক্ষমতা দিয়ে নিত্যনতুন করে সাজিয়ে নতুন নতুন বাক্য সৃজন করে থাকে। এই বাক্য সৃজনের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন বলেই চমস্কির ব্যাকরণকে সৃজনমূলক ব্যাকরণ (generative grammar) বলে। চমস্কির এই মূল তত্ত্বটি সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী Manfred Bierwisch। তিনি তাঁর 'Modern Linguistics' (1971) গ্রন্থে লিখেছেন—

> "The Theory centres on the following simple but essential observation. Who ever speaks a natural language does not simply carry around in his head a long list of words or sentences which he has stored, but is able to form new sentences and to understand utterances he has never heard before. The command of language is thua a productive capacity not merely the knowledge, of an extensive nomenclature ..... The theory ..... is, then, mianly concerned with accounting for how sentences are generated, and is appropriately called 'generative' grammar".

ভাষার সৃজনশীল ধর্ম চমস্কি প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করলেও এর পূর্ব সূচনা তিনি দেখেছিলেন জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ হুমবোল্টের মধ্যে। তিনিই প্রথম বলেছিলেন নির্দিষ্ট সংখ্যক ভাষা উপাদানের অধিকারী হলেও এর সাহায্যে অসংখ্য বাক্য সৃজন করতে পারে।

"Die sprahe muns von endtichen
Mitteln einen unendlichen machen".

এ প্রসঙ্গে একালের একজন বিশিষ্ট মনীষী অধ্যাপক বলেছেন—"..... that the work of year and Panini anticipated the methodologs of Descriptive Linguistics"। কিন্তু চমস্কিও বহুপূর্বেই Synchronic Descriptive Analyses বা এককালিক বর্ণনাত্মক ভাষাবিজ্ঞানের নিদর্শন তুলে ধরেছেন।

মাতৃভাষাভাষী বক্তার মধ্যে যে সৃজনী ক্ষমতা আছে, তার দুটি দিক আছে। যথা—বাস্তব ব্যবহারের দিক ও আদর্শ সম্ভাবনার দিক। প্রথমটিকে চমস্কি বলেছেন performance এবং দ্বিতীয়টিকে বলেছেন competence। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কথাবার্তায় ভাষাকে আমরা যেভাবে প্রয়োগ করি তাতে ভাষা ব্যবহারের সমস্ত সম্ভাবনাই কাজে লাগে না। ফলে অন্তর্নিহিত সব সম্ভাব্য পরিস্থিতি বর্তমানে শেষ করা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার খানিকটা সবসময়ই প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। এই সম্ভাবনায় ভাষার আদর্শ রূপ থাকে। ভাষায় পরিপূর্ণতায় সেই আদর্শ রূপের সবটার বাস্তব প্রকাশ ঘটে না। যেটুকু বাস্তব ঘটে, বক্তার প্রয়োগের সেই বাস্তব ব্যবহারকে বলে performance। আর ভাষার পরিপূর্ণতার যেটুকু আদর্শ (ideal) রূপে থেকে যায়, তাকে বলে সম্ভাবনা বা competence। ভাষাতত্ত্ববিদ্ কিন্তু ভাষার বাস্তবরূপ (performance) বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু ভাষার আদর্শ সম্ভাবনা (competence) সম্পর্কে কোনো বিধিনিষেধমূলক (normative / prescriptive) যান্ত্রিক ব্যাকরণ রচনা পারেন না। তাই চমস্কি নিজেই তার 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছেন—

> "When we speak of a grammar as generating a sentence with a certain structural description, we mean simply that the grammar assigns this structural description to the sentence ..... this generative grammar does not, in itself, prescribe the character or functioning of a perceptual model or a model of speach production".

অর্থাৎ ভাষা যেমন সৃজনশীল প্রক্রিয়া, ব্যাকরণও তেমনি সৃজনশীল উদ্‌ঘাটন। ব্যাকরণ হল বিশ্লেষণ ও বর্ণনা, কিন্তু তা কখনওই কোনো যান্ত্রিক বিধান নয়।

ভাষার পারঙ্গমতাবোধ হল ব্যক্তির অন্তর্গত মাতৃভাষা সম্পর্কিত ধারণা। চমস্কির মতে আদর্শ বক্তা শ্রোতার ওপরই ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রাথমিকভাবে নির্ভর করে। এই আদর্শ বক্তা-শ্রোতা একই ভাষা সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এই আদর্শ বক্তা-শ্রোতা ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞানপ্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত অপ্রয়োজনীয় শর্ত স্মৃতিগত সীমাবদ্ধতা, ছড়িয়ে বলা, আকর্ষণ ও মনোযোগ বদলানো ও ভুল বলাতে আক্রান্ত হবে না। তবেই তাকে প্রকৃত ভাষা ব্যবহার বলা যাবে। এ ক্ষেত্রে চমস্কি সঞ্জননী পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে আদর্শ বক্তা শ্রোতার ভাষার পারঙ্গমতাবোধ একটি ভাষার ব্যাকরণ বিশ্লেষণ করবে। যদি ব্যাকরণ

নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যামূলক হয় এবং তা বক্তা-শ্রোতার ভাষা ব্যবহারকে বিশ্লেষণ করে, তবে তাকে সঞ্জননী ব্যাকরণ বলা যাবে। চমস্কি নিজেও বলেছেন—

> "By a generative grammar I mean simply a system of rules that is same explicit and well defined way assigns structural descriptions to sentences".

সুতরাং সঞ্জননী ব্যাকরণ হল সূত্রগত পদ্ধতি, যা বাক্য বিশ্লেষণে গঠনগত ভাবে যুক্ত থাকে। একটি ভাষার বক্তারা অবশ্যই এই সঞ্জননী ব্যাকরণে দক্ষ থাকে ও সেই ব্যাকরণ আয়ত্ব করে ধারনায় রেখে দেয়। আর সেই ধারণাই ভাষাগত জ্ঞানকে প্রকাশ করে—একেই বলে competence বা পারঙ্গমতাবোধ।

সাধারণভাবে Transformation-এর বাংলা পরিভাষা 'রূপান্তর বা পরিবর্তন' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে চমস্কি যে Transformation-এর কথা বলেছেন, তা ঠিক রূপান্তর বা পরিবর্তন নয়, তা সংবর্তন। 'সংবর্তন' এর অর্থ বিশেষভাবে স্থাপন বা নিষ্পাদন। অর্থাৎ Transformation হল সংবর্তনী। সংবর্তনী ব্যাকরণে চমস্কি কতগুলি প্রতীক সূত্রের সাহায্যে বাক্য বিশ্লেষণ করেন। কারণ তাঁর মূলতত্ত্ব যান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি। এটাকে বোঝানোর জন্য বাক্যকে ভাঙার দরকার। গঠন সর্বস্বতাবাদী জেলিগ হ্যারিস সর্বপ্রথম ভাষাতত্ত্বের বিভাজন পদ্ধতির প্রতীকের সাহায্যে রূপমূল ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন। আর চমস্কির মতে সংবর্তন প্রক্রিয়ায় পরিণাম হল সঞ্জনন। তাঁর মতে প্রত্যেক ভাষায় Kernel Sentence থাকে। সংবর্তনের ফলে সেগুলি থেকে নতুন নতুন বাক্য সঞ্জনন করা যায়। পবিত্র সরকারের মতে সংবর্তন তিনটি—১। প্রশ্ন সংবর্তন, ২। নেতি সংবর্তন, ৩। প্রশ্ন সংবর্তন। এ তিনটিকে তিনি নাম দিয়েছেন ঐক্য সংবর্তন বা Singular Transformation। এরপর যৌথ সংবর্তন যা থেকে যৌগিক বা জটিল বাক্য আছে। আর চমস্কির মতে বাক্যগঠনের অন্তরালে একটি কর্মকাণ্ড আছে। তিনি সেই কর্মকাণ্ডটিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখালেন। যেমন—অঙ্গন্যাসের নিয়মাবলী—সংবর্তনের নিয়মাবলী—ধ্বনিগত পরিবর্তনের নিয়মাবলী—প্রকাশিত বাক্য। এটি আসলে বাক্যগঠনের নিয়মাবলী। যার দ্বারা একটি বীজবাক্য তৈরি হয়। এটিকে ইংরেজিতে বলা হয় Constituent Structure বা Phrase Structure rules। এরই ওপরে ভিত্তি করে যে বীজবাক্যটি তৈরি হয় তার উপরে সংবর্তনের নিয়মগুলিকে বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ অনুযায়ী আরোপ করে নতুন করে বাক্য তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতেও বাক্যটি পুরোপুরি প্রকাশিত হবে না। তখন তাতে তৃতীয় আর একটি ধাপ জুড়তে হয়, যাকে বলা হয় ধ্বনিগত পরিবর্তনের বা সংবর্তনের নিয়মাবলী। পরপর এই তিনধাপ নিয়মের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রকাশিত বাক্যটি পূর্ণ চেহারা পায়। সর্বনিম্নে থাকে অঙ্গন্যাসের নিয়মাবলী, দ্বিতীয় ধাপে বাক্য সংবর্তনের নিয়মাবলী, তৃতীয় ধাপে ধ্বনিগত সংবর্তনের নিয়মাবলী। তারপর চতুর্থ ধাপে পাওয়া যাবে প্রকাশিত বাক্য অর্থাৎ বাক্যের পুরো চেহারা। তবে এই সব সংবর্তনের কিছু স্বাধীন বা optional এবং কিছু আবশ্যিক বা obligatory। আবশ্যিক সংবর্তন ব্যাকরণের আইন মানতে বাধ্য। আর স্বাধীন সংবর্তন বক্তার আয়ত্তাধীন হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে হ্যারিস ধ্বনিতত্ত্ব থেকে শুরু করেন। আর তাঁর শিষ্য চমস্কি প্রথমে বাক্যতত্ত্ব এবং ক্রমপর্যায়ে শব্দতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ চমস্কি, গুরু হ্যারিসের পদ্ধতির বিপরীত প্রান্ত থেকে শুরু করেন। তবে বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চমস্কি প্রথমার্ধের গঠন সর্বস্বতাবাদীদের মতো কেবলমাত্র বহিরঙ্গের গঠনকে গুরুত্ব দিলেন না, পাশাপাশি বহিরঙ্গ গঠনের অন্তরে যে গভীর অর্থগত দিক রয়েছে তাকেও উপযুক্ত গুরুত্ব দিলেন। তাই তাঁর ভাষা জ্ঞান বলতে এক ভিন্নতর বোধ সহজাত হয়—

> "Knowledge of a language involves the ability to assign deep and surface structure to a infinite range of sentences to relate this structures appropriatily and to assign semantic interpretation and a phonetic interpretation to the paried deep and surface structure".

অর্থাৎ চমস্কির ভাষাবিজ্ঞান বলতে বোঝায় অসংখ্য বাক্যের ভাষার অধোগঠনে বা Deep Structure এবং অধিগঠন বা Surface Structure। ভাষার অধিগঠনটি আমাদের ধ্বনিপ্রবাহ দিয়ে গঠিত। আর অধোগঠনটির সঙ্গে রয়েছে ভাষার অর্থের যোগ।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'Syntactic Structure' এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'Aspect of the theory of Syntax' গ্রন্থে চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণের বেশ কয়েকটি মডেল দিয়েছেন। যেমন—Model Finite state grammar। এখানে তিনি ব্যাকরণের সহজতম গঠনের কথা বললেন। ব্যাকরণ কোনো যন্ত্র নয়—পুনর্গঠন তত্ত্বের মাধ্যমে এটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে এগিয়ে যায়। এটি শুরু হয় সূচনা অংশ—start থেকে, আর শেষ হয় stop-এ। পুনর্গঠন তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা সূচনা থেকে একাধিক বাক্য পাই। যেমন—

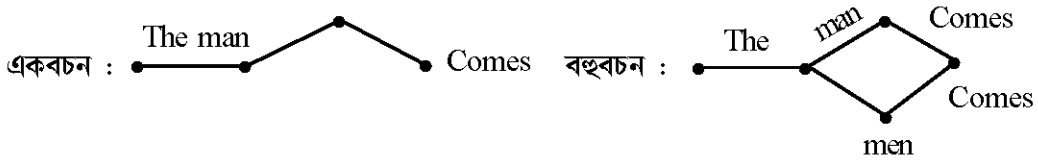

'phrase structure Grammar'-এ চমস্কি জানালেন আন্তরিক স্তরে ভাষাতাত্ত্বিক বর্ণনা উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্রবদ্ধ হয়। এই সূত্রকে প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে বললেন—

(1) Sentence → NP (Noun phrase) + VP (Verb phrase)

(2) NP → T (the) + N (Noun, Man, ball)

(3) VP → Verb + NP (Noun phrase)

উদাহরণ : (1) The man took the ball

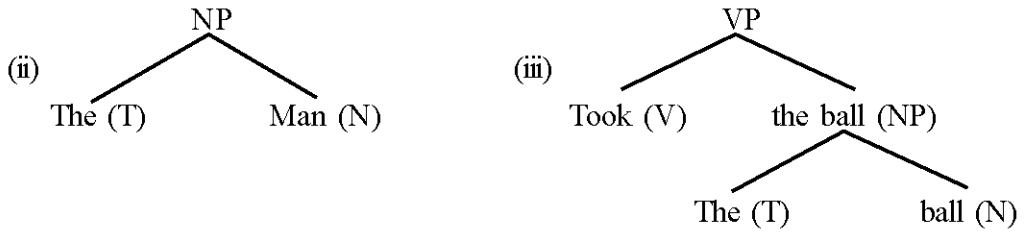

Phrase Structure-এর মাধ্যমে শুধু বাক্য বিশ্লেষণের গঠনই জানতে পারা গেল না, সেই সঙ্গে বাক্যের অর্থের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক সূত্রটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। ফলত চমস্কির নতুন পদ্ধতি ভাষার অস্পষ্টতাকে মুছে দিল। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক একটি বাক্য—রামমোহন প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন—এই বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট। অর্থাৎ এর একাধিক অর্থ হতে পারে—

(১) সতীদাহের বিরুদ্ধে অনেকেই আন্দোলন করেছেন, প্রথম যিনি করেন, তিনি রামমোহন।

(২) সতীদাহের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আগে হয়নি, রামমোহনই প্রথম করেছেন।

বাক্যটির এই একাধিক অর্থ হবার কারণ 'প্রথম' শব্দটির সঙ্গে বাক্যের কোনো শব্দের সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু চমস্কির এই নতুন সূত্র প্রতীকের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই জেনে নিতে পারি—'প্রথম'টির সঙ্গে কোন শব্দের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। যদি সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন এর সঙ্গে 'প্রথম'-এর সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক হয়, তবে ১নং অর্থটি পাওয়া যায়। আর যদি আন্দোলন করার সঙ্গে 'প্রথম'-এর সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক হয়, তবে ২নং অর্থটি পাওয়া যায়। এই বাক্যে 'প্রথম' শব্দটির অর্থ অস্পষ্ট। এর অভিধানিক অর্থ দিয়ে বাক্যটির অর্থ পরিষ্কার হচ্ছে না। 'প্রথম' শব্দটি বিশেষণ, কি ক্রিয়ার বিশেষণ তা বোঝা যাচ্ছে না। পদ পরিচয় (part of speech) ধরা যাচ্ছে না বলে প্রচলিত ব্যাকরণ (traditional grammar) এই বাক্যের অর্থ নির্ণয় করতে ব্যর্থ। শব্দটির গঠনগত এমন কোনো চিহ্ন নেই (বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি) বা বাক্যগঠনে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, যাতে এই শব্দের অর্থটি ধরা যায়। এবং বাক্যের অর্থগত শৈথিল্যকে উদ্‌ঘাটন করা যায়। এখানে গঠন সর্বস্বতাবাদীদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। এখানে উপায় হচ্ছে পূর্বোক্ত প্রকারে নির্ণয় করা যে বাক্যের অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে 'প্রথম' শব্দটির সবচেয়ে কাছের সম্পর্ক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি বাক্যে শব্দগুলি সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার তারতম্য আছে। আর সেটা চমস্কি একটি বাক্যের পদসমূহকে পারম্পর্যের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন। একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক কত দূরের বা কত কাছের সেটা বিশ্লেষণ করেছেন। এই রীতিতে যদি বাক্যটির অর্থের বিশ্লেষণ করা যায় তবে এর অর্থের অস্পষ্টতা বোঝা যাবে। এতে 'প্রথম' শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝা যাবে। চমস্কি পরিকল্পিত পরম্পরা বিন্যাসর (helrar chical arrangement) চিত্রে

বাক্যটিকে সাজানো। এই বাক্যের (রামমোহন প্রথম সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন) দুটি অর্থ এবং তার গঠনগত কারণ ধরা পড়তে পারে। যেমন—

১নং অর্থ :

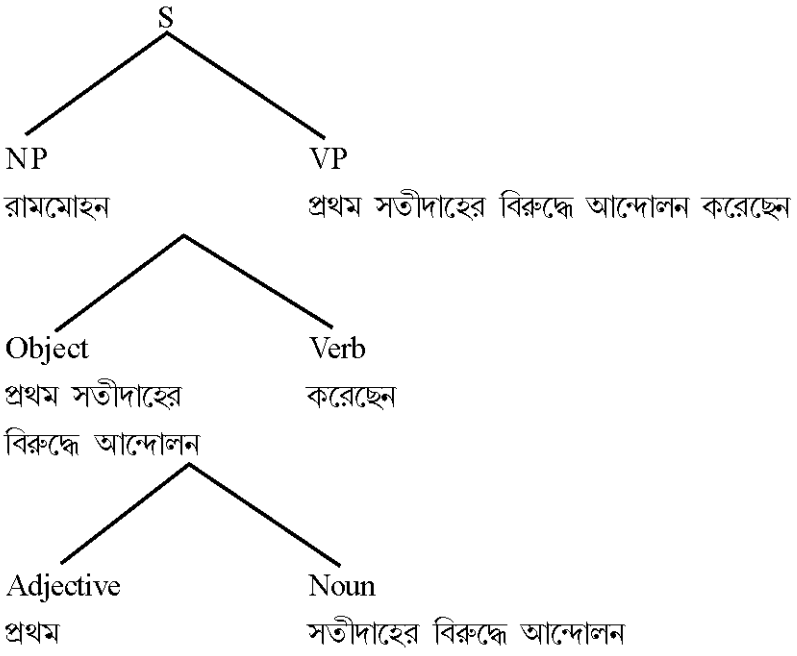

(চিত্র নং ২)

২নং অর্থ :

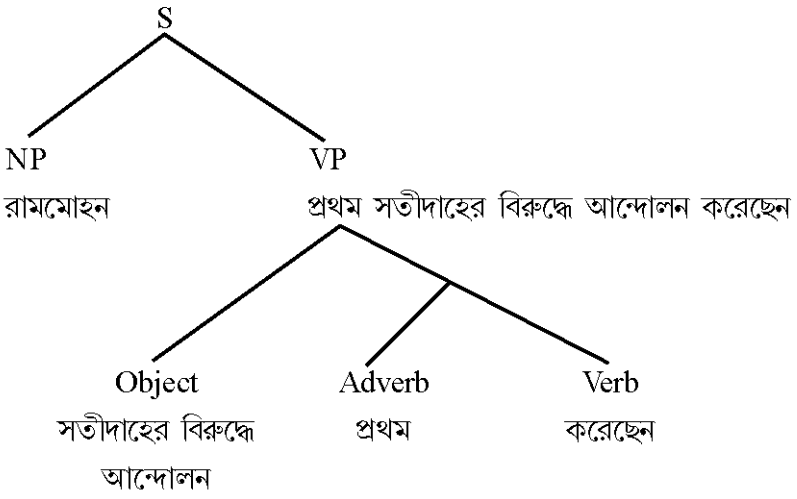

এবারে চমস্কির ব্যাকরণের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল ভাষাগত বিশ্বজনীনতা-র (Linguistic Universal) তত্ত্ব। তবে একথা ঠিক যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের স্বনিম সংখ্যা আলাদা। স্বনিমের ক্রিয়াপদ্ধতি আলাদা। এমনকি শব্দরূপ ধাতুরূপের বিধান এবং বাক্যগঠনের রীতিও পৃথক। তবুও সব ভাষার মধ্যে এমন কিছু সাধারণ ধর্ম আছে, তেমনি ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে কিছু মূলীভূত ঐক্যও আছে। বিভিন্ন ভাষা ও ব্যাকরণের মধ্যে মূলীভূত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের মূল ঐক্য যে মনুষ্য প্রকৃতি তার ওপরে। জাতিতে জাতিতে যত পার্থক্যই থাকুক মানুষ সর্বত্র এক। তার রক্তমাংসের দেহ তার দেহযন্ত্র বাগ্‌যন্ত্র থেকে শুরু করে তার গভীর মানবিক চাহিদা এবং তার উচ্চতর মানবিক অনুভূতি মূলত এক। এর ফলে সব জাতির ভাষা প্রক্রিয়ায় এবং ব্যাকরণে একটা মূল সর্বগত ঐক্য আছে।

উল্লেখ্য, এই বিরাট মানবিক ঐক্যের উপরেই বিশ্বজনীনতা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। এর উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের বিভিন্ন উপাদানে যে মূল ঐক্য থাকে, তাকে বলা হয় Substantive Universals।

একটি ভাষার বাক্যগঠনের বাহ্যরূপে অন্য ভাষার বাক্যগঠনের কিছু থাকতে পারে। কিন্তু দুই ভাষার বাক্যগঠনের গভীর স্তর (deep structure) তলিয়ে দেখলে একটা অন্তরালগামী ঐক্য ধরা পড়বে। যেমন ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা দুটি বাক্যে বিশ্লেষণ করা যাক—

বাংলা—মানিক মোটা বই পড়ে।

ইংরেজি—Manik reads voluminous books.

বাক্যদুটির গঠন বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়—

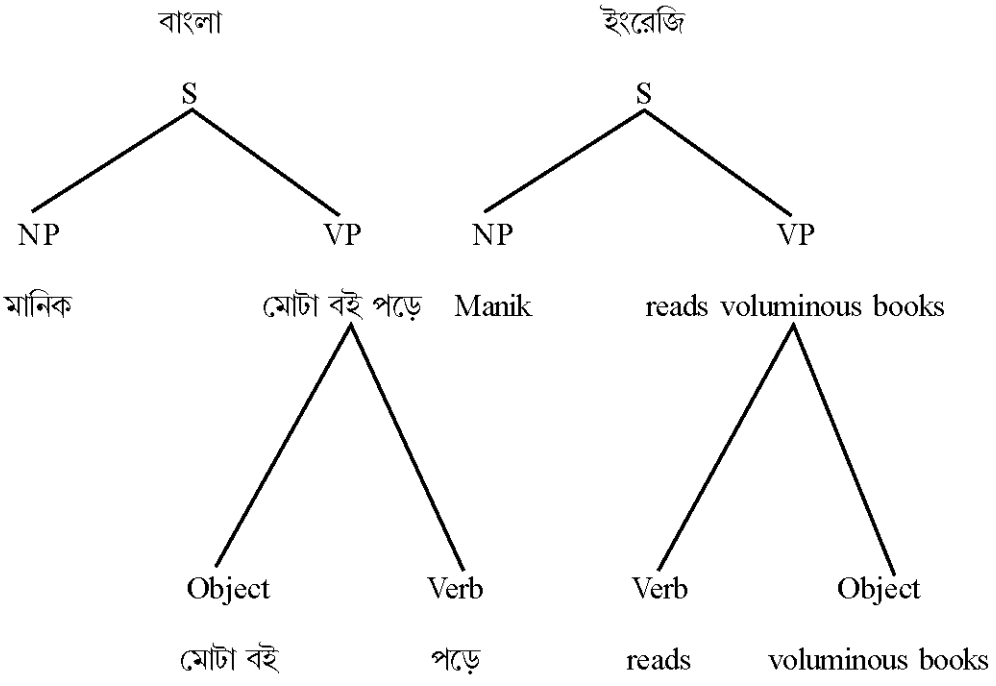

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে Object (মোটা বই) Verb (পড়ে) এর আগে বসেছে। আবার ইংরেজিতে Verb (reads)-ই Object (books)-এর আগে বসেছে। সুতরাং দুই ভাষার মধ্যে বাক্যের গঠনে পার্থক্য আছে। কিন্তু একথা ঠিক যে, দুই ভাষার বাক্যেই NP ও VP আছে এবং দুই ভাষার বাক্যেই Verb ও Object আছে। এই NP, VP, Verb ও Object-এর ধারণা স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নতা সব ভাষাতেই থাকে। এই মূলীভূত ধারণাগুলিই হল Linguistic Universal। কিন্তু অনেক সময় ভাষার বাহ্যগঠনে সবসময় NP, VP ইত্যাদি ধরা পড়ে না। কিন্তু তার আন্তরগঠনে সেগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। যেমন 'বেরিয়ে যাও'। এ বাক্যে শুধু VP আছে। কিন্তু NP (তুমি) উহ্য আছে। Linguistic Universal-গুলি সবসময় ধরা পড়ে না। কিন্তু এগুলি হল ভাষার আন্তরগঠনের মূল সত্য। সহজ করে এটাই হল চমস্কির Linguistic Universal-এর তত্ত্ব। এই প্রসঙ্গে Manfred Bierwisch তাঁর 'Modern Linguistics' গ্রন্থে চমস্কির তত্ত্ব-র সমর্থন করে বলেছেন—

> "The analysis of various language types has show that the deep structures, despite differences between structural types, have essential properties in comnmon. Even without any knowledge of chinese or Mohawk one could understand the semantio structure of their sentences if one knew the meaning of their morphemes and their deep structure. This lods of the assumption that the basic syntactic categories and functions such as subject predicate, object, verb, adverb, noun etc. are substantive universals. Corresponding to the basic in ventory of phonological and semantic features there is then a set of syntactic categories from which each language makes a characteristics selection".

তবে আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি যে পদ্ধতি খাড়া করেছিলেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তীকালে নানা বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে। যেমন চমস্কির ছাত্র রম ও লেকভ। চমস্কির মতে Deep Structure গড়ে ওঠে মানুষের বোধের মধ্যে এবং তা থেকে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের বাক্য সংবর্তন এর ফলে। কিন্তু রম ও লেকভের মতে এই নিয়মাবলী প্রধানত অর্থ নির্ভর। অর্থ বুঝতে সাহায্য করে চমস্কির ছক—

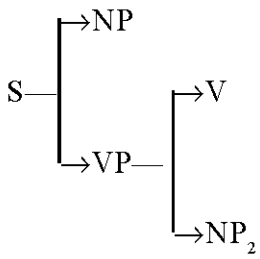

NP = Noun phrase

VP = Verb phrase

V = Verb

S = Sentence

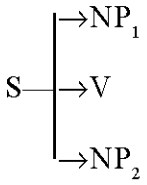

রম ও লেবভের ছক

তবে চমস্কির তত্ত্ব বিতর্কিত হলে তিনি দেখালেন যে কতরকমের সংবর্তন হতে পারে আর বাক্যের generation বা সঞ্জনন কি কি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা Rule governed এবং নিয়মগুলি কেমনভাবে প্রযুক্ত হয়। এরপর এই Rule লেখার জন্য Notations ও উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। এরপর সংবর্তনেরও সঞ্জননের প্রক্রিয়াগুলির কথা বলেছেন। যদিও সেগুলি ইংরেজি ভাষার জন্য প্রয়োজন হতে পারে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সবগুলি প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও চমস্কির এই তত্ত্বের আলোচনা খুবই উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় এটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ।

৩০২.৪.১৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। চমস্কি কে ছিলেন? বিংশ শতকের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় চমস্কির অবদান লেখো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৬

বাংলা পদগুচ্ছ সংগঠন (বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ)

বিন্যাস ক্রম :

৩০২.৪.১৬.১ : বাংলা ভাষার সংবর্তন

৩০২.৪.১৬.২ : বাক্য সংবর্তন

৩০২.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০২.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০২.৪.১৬.১ : বাংলা ভাষার সংবর্তন

বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসরণ করেই নোয়াম চমস্কি বাক্য বিশ্লেষণের যে সূত্র নির্মাণ করেছেন তার বিন্যাস বিশেষ ব্যাকরণের। কারণ, তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠন বিশ্লেষণ করার প্রসঙ্গ ধরেই অধোগঠন এবং অধিগঠনের বৃক্ষচিত্র এবং পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র (Phrase Structure Rule) তৈরি করেছেন। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে বৃক্ষচিত্রর বিন্যাস পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র হুবহু চমস্কি যেভাবে দেখিয়েছেন সেভাবে হবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান লেখকের 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এখানে সংক্ষেপে বাংলা ভাষায় বৃক্ষচিত্র ও পদগুচ্ছ সংগঠন সূত্র দেওয়া হল।

বাক্য → বিশেষ্যগুচ্ছ + ক্রিয়াগুচ্ছ [বি. গুচ্ছ + ক্রি. গুচ্ছ]

বি. গুচ্ছ → নির্দেশক + বিশেষণ + বিশেষ্য [নি. + বিণ. + বি.]

ক্রি. গুচ্ছ → বি. গুচ্ছ + ক্রিয়া + সহায়ক

সহায়ক → বিভক্তি [কালবিভক্তি, ভাব বিভক্তি, প্রকার বিভক্তি], নঞর্থক, প্রশ্নবোধক

বি. → বই, গাছ, আমি...

বিণ. → ভালো, খারাপ, দামী...

ক্রি. → যা, খা, বল্, শুন্...

নি. → ঐ, এই, কই...

ইংরেজি ভাষায় সহায়কের গুরুত্ব বেশি। তাই সহায়ক প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত। বাংলা ভাষায় সহায়ক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেকারণে সহায়ককে প্রধান উপাদান শ্রেণি হিসেবে দেখা হয় না। ক্রিয়াগুচ্ছর অন্তর্গত একটি শ্রেণি হিসেবে দেখা হয়। ইংরেজি বাক্যের বিন্যাসক্রম হল—'কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম' = [SVO], কিন্তু বাংলা বাক্যের প্যাটার্ন - [SVO] বা কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া গঠন। তাই ইংরেজি ভাষার বৃক্ষচিত্রে যেমন কর্মকে বাক্যের শেষে রাখা হয়েছে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটা করা চলে না। তাই বিন্যাসক্রম ইংরেজির মতো না হয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী হবে। কয়েকটি বাক্য বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

১. এই সাদা গরুটি ঐ সবুজ মাঠে চরেছিল।

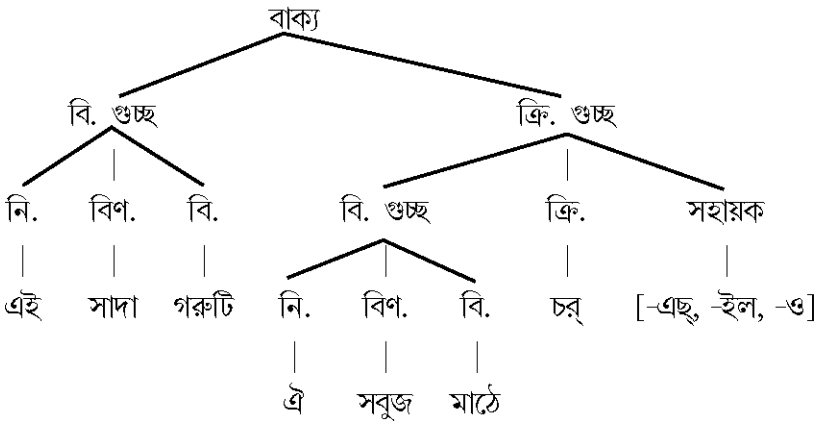

২. তুমি বাড়ি যাবে কি?

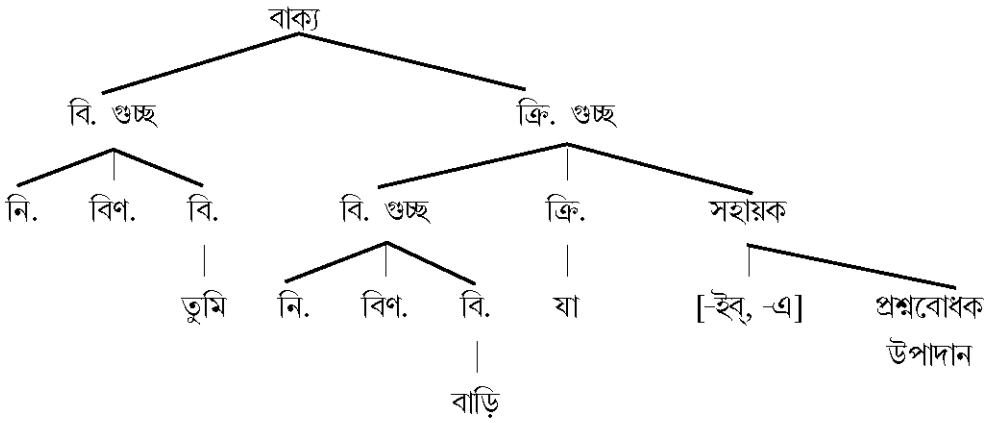

৩. এই ভিজে বিড়ালটি কাল মাছ খায়নি।

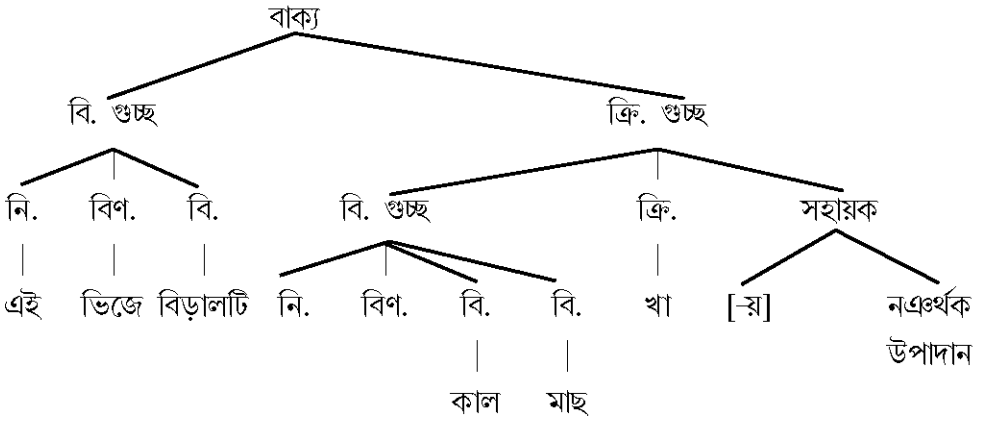

৪. ঐ সবুজ ঘাসে ঢাকা মেঘে-ছাওয়া দিগন্ত-বিস্তৃত মেয়েটি গতকাল এসেছিল।

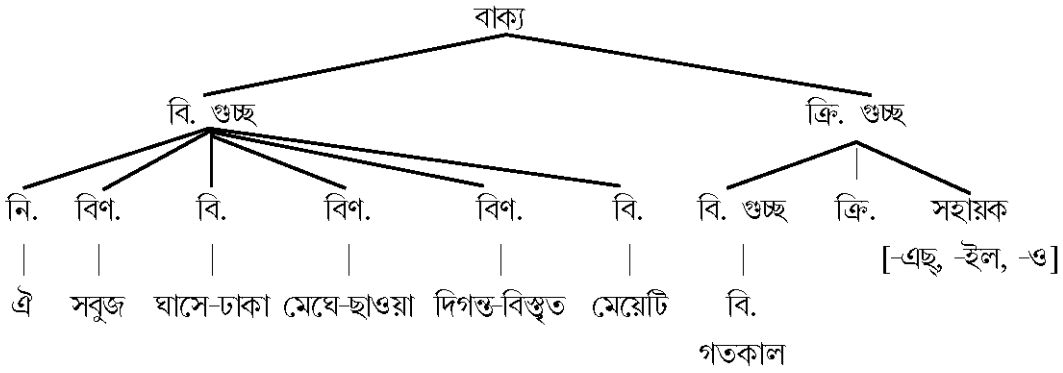

প্রথম তিনটি বাক্য স্বাভাবিক। চতুর্থ বাক্যটির বক্তব্যে রয়েছে অর্থগত বিসঙ্গতি। যদিও কবিতার ভাষায় এধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। 'মেয়েটি'-র বিশেষণ হিসেবে যে পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির অর্থগত বিপর্যাস একটি প্রতীক অর্থ ব্যঞ্জিত করে। ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এবং সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাক্য গ্রহণযোগ্য বাক্য নয়। প্রথম বাক্যটি সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। দ্বিতীয়টি প্রশ্নবোধক বাক্য এবং তৃতীয়টি হল নঞর্থক বাক্য। নিজের উদাহরণগুলিতে গঠন অনুসারে ভিন্ন ধরনের বাক্য বৃক্ষচিত্রে দেখানো হল।

ক. মৌলিক (= সরল) বাক্য (mono-clause structure)। এই বাক্য একটিমাত্র বাক্যখণ্ড দিয়ে গঠিত।

১. আমি বাড়ি যাব।

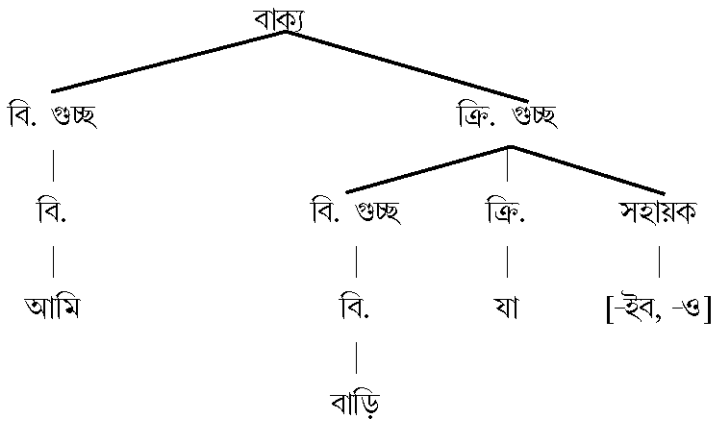

২. আমি পড়তে বসব।

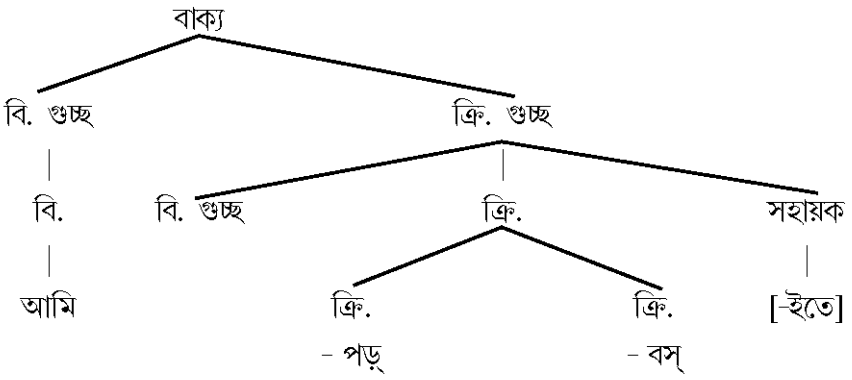

খ. অমৌলিক বাক্য। সংযোগমূলক বাক্য (Co-ordinating structure)

৩. আমি বাড়ি যাব এবং আমি চাউ খাব।

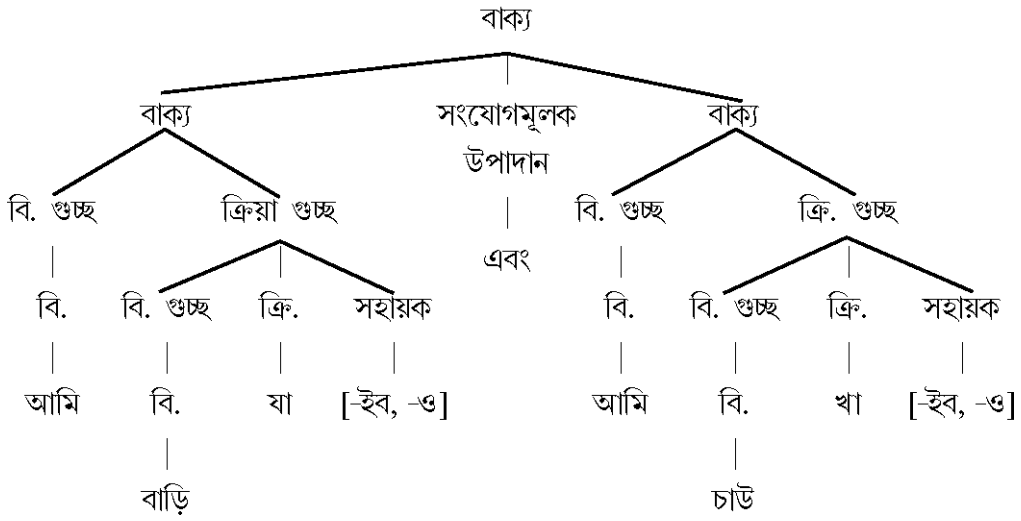

৪. আমি তাকে ডেকেছি আর সে-ও এসেছে।

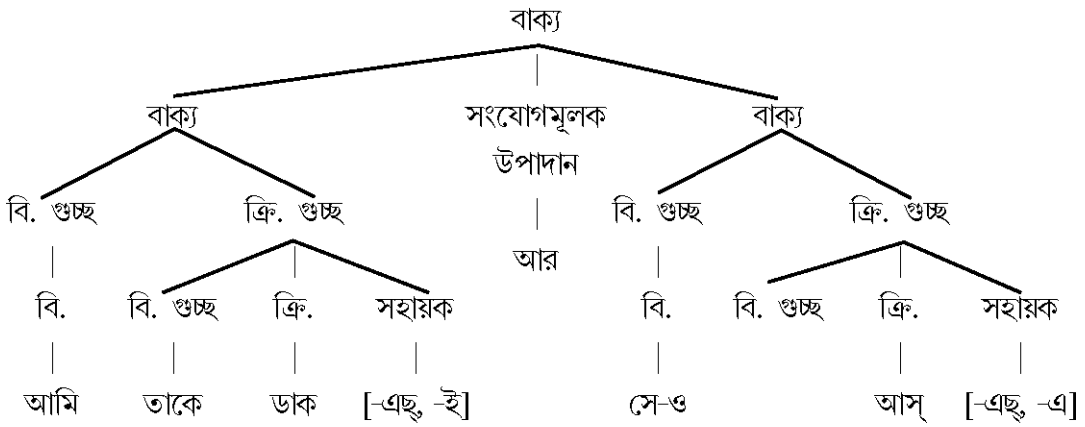

গ. অ-মৌলিক বাক্য। আশ্রয়মূলক বাক্য (Sub-ordinating structure)।

৫. আমি বাড়ি গিয়ে চাউ খাব।

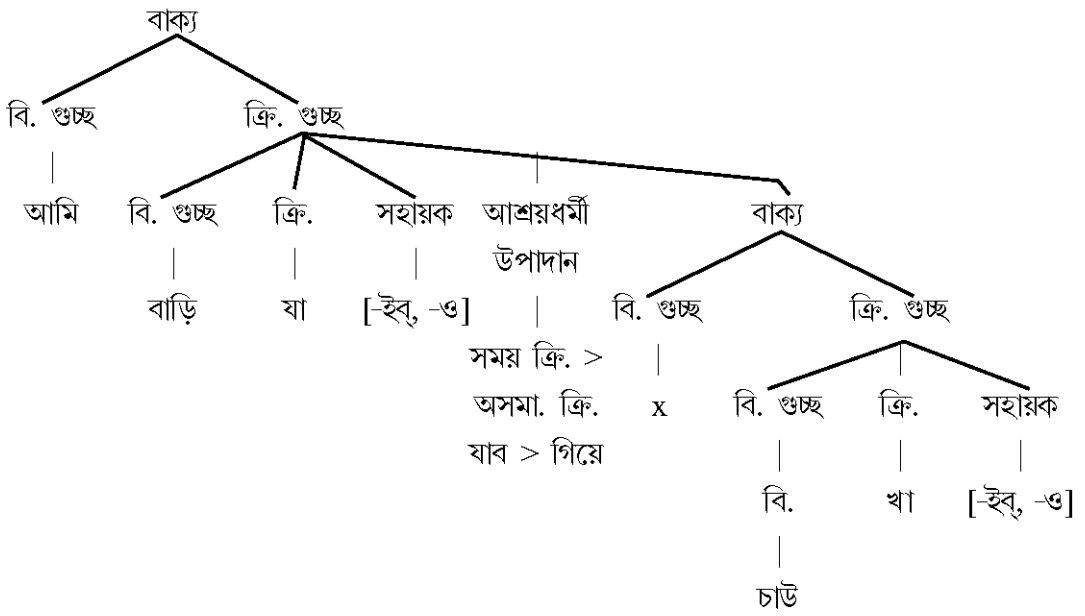

৩০২.৪.১৬.২ : বাক্য সংবর্তন

পরিণাম অনুসারে সংবর্তন চার ধরনের। কোনো উপাদান বাড়তি যোগ হলে বলা হয় সংযোজন (Addition)। কিছু বাদ গেলে বলা হয় বিলোপন (Delection)। একটি উপাদানের বদলে অন্য উপাদান ব্যবহৃত হলে হয় রূপান্তরণ বা বি-স্থাপন (Substitution)। দুটি উপাদানের পারস্পরিক অবস্থান বদলালে হল বিপর্যাস (Extraposition)। যখন আমরা কথা বলি তখন এ ধরনের অজস্র সংবর্তন ঘটতে থাকে। একটি বাক্য অধোগঠন থেকে অধিগঠনে রূপান্তরিত হবার সময় এক বা একাধিক সংবর্তন হতে পারে। যত ধরনের সংবর্তন হোক না কেন সব ধরনের সংবর্তনকে এই চার শ্রেণির অন্তর্গত করা হয়।

সংবর্তনে নানা ধরনের নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন—প্রশ্ন সংবর্তন, নঞ্ সংবর্তন, বিগর্ভন, বিশেষ্যীভবন, সংযোজন, স্থিতি ক্রিয়া বিলোপন ইত্যাদি। এগুলি সবই পরিণাম অনুসারে যে-কোনো একটি বা একের বেশি সংবর্তনের এলাকায় থাকবে। প্রথমে পরিণাম অনুসারে চার ধরনের সংবর্তন আলোচনা করব। পরে বিশেষ ধরনের কিছু সংবর্তন দেখানো হবে।

ক. সংযোজন (Addition) :

বাক্যে বাড়তি উপাদান যুক্ত করাকে সংযোজন বলে। কোনো কিছু বক্তব্য জোর দিতে গেলে নিশ্চয়ার্থক-ই ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি যাব' বনাম 'আমি যাবই' বা 'আমিই যাব'। 'আমি যাব'। 'আমি যাব' সাধারণ বিবৃতি। নিশ্চয়ার্থক 'ই' যোগ করে বক্তব্যের বিশেষ রূপ তৈরি করা হয়েছে। অধোগঠন থেকে সংবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে অধিগঠন তৈরি হচ্ছে তা বৃক্ষচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল—

১. আমি যাব > আমিই যাব।

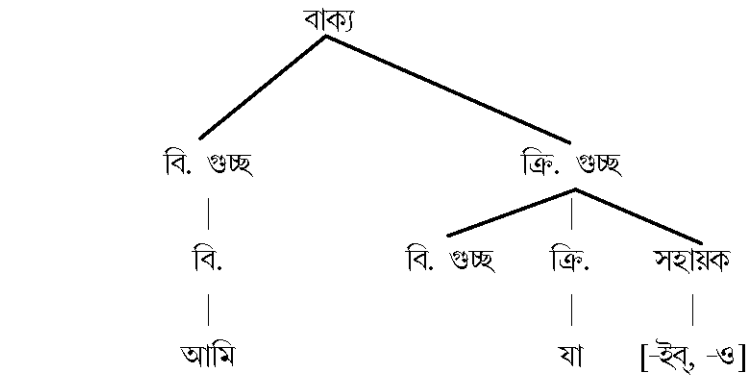

২. আমি যাব > আমি যাবই

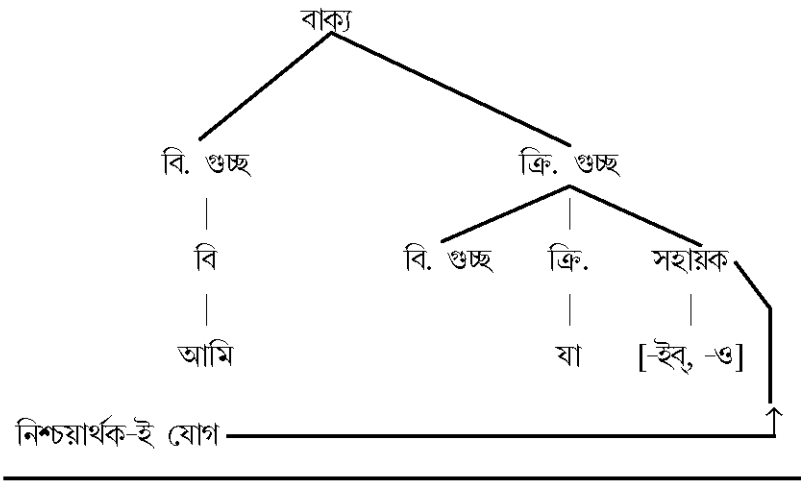

অধিগঠন → আমিই যাবই।

৩. তুমি এসেছো > তুমিই এসেছো

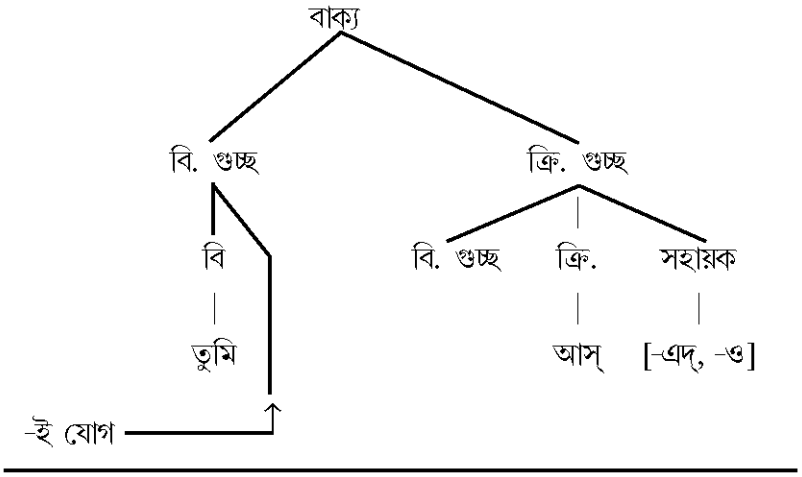

অধিগঠন → তুমিই এসেছো!

৪. তুমি বাড়ি থাকবে > তুমি বাড়িতেই থাকবে

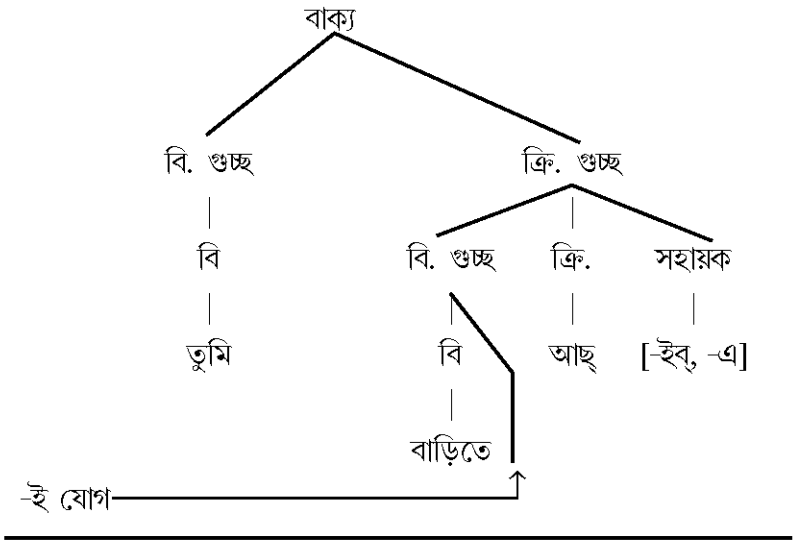

অধিগঠন → তুমি বাড়িতেই থাকবে!

এই ধরনের সংযোজনকে '-ই সংযোজন' বলে। আবার 'যে সংযোজন' -ও বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় যেমন, (দ্রুত লেখার জন্য ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে।)

৫. তুমি বললে > তুমি বললে যে

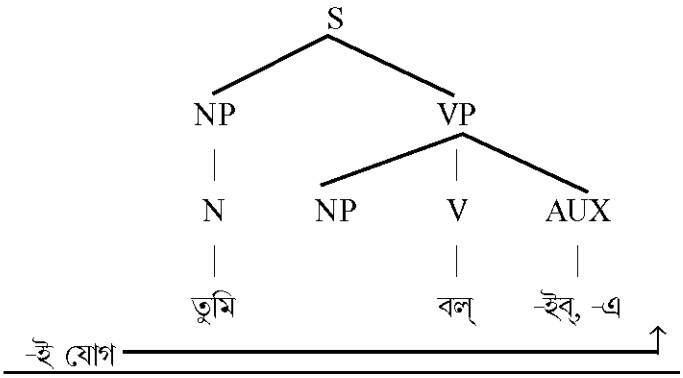

তুমি বললে যে

৬. তুমি বললে > তুমি যে বললে

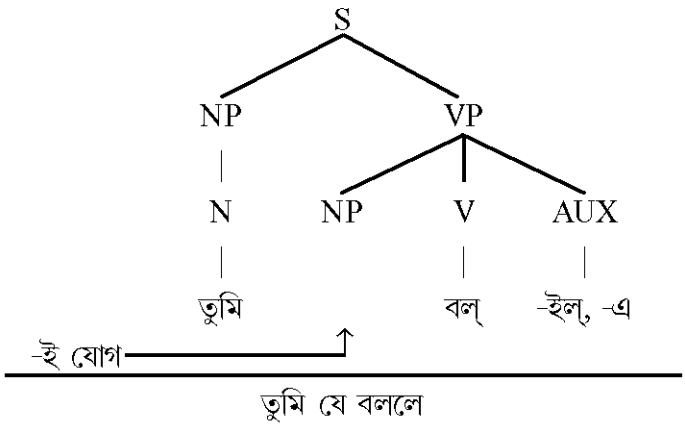

একের বেশি বাক্যকে জুড়ে একটি বড় বাক্য তৈরি করাও বাক্য সংযোজন। সংযোগধর্মী উপাদান বা আশ্রয়ধর্মী উপাদান এখানে যুক্ত করা হয়। এই ধরনের বাক্যের গঠনে একটি বাক্যের মধ্যে একের বেশি বাক্য যুক্ত হয়। যেমন—

বাক্য ১ - আমি বাড়ি যাব।

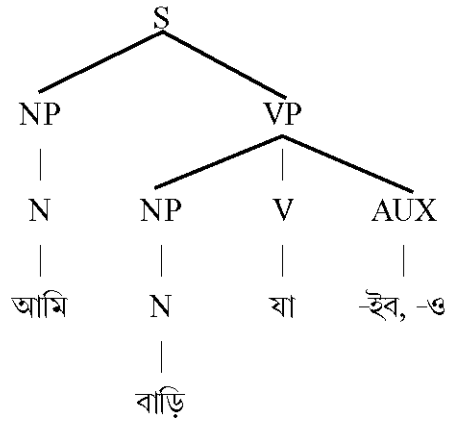

বাক্য ২ - রহিম এখানে থাকবে।

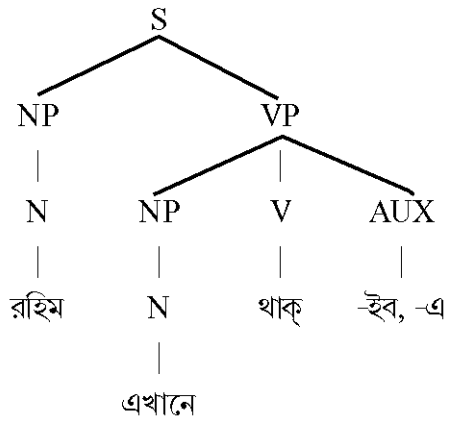

এই দুটি বাক্যের ক্ষেত্রে যেমন সংযোগমূলক উপাদান যোগ করে সংযোগধর্মী বাক্যে পরিণত করা যায় তেমনি আশ্রয়মূলক উপাদান যোগ করে আশ্রয়ধর্মী বাক্য হিসেবেও সংবর্তিত করা সম্ভব। এখানে এক এক করে এই দুধরনের সংযোজন দেখানো হল—

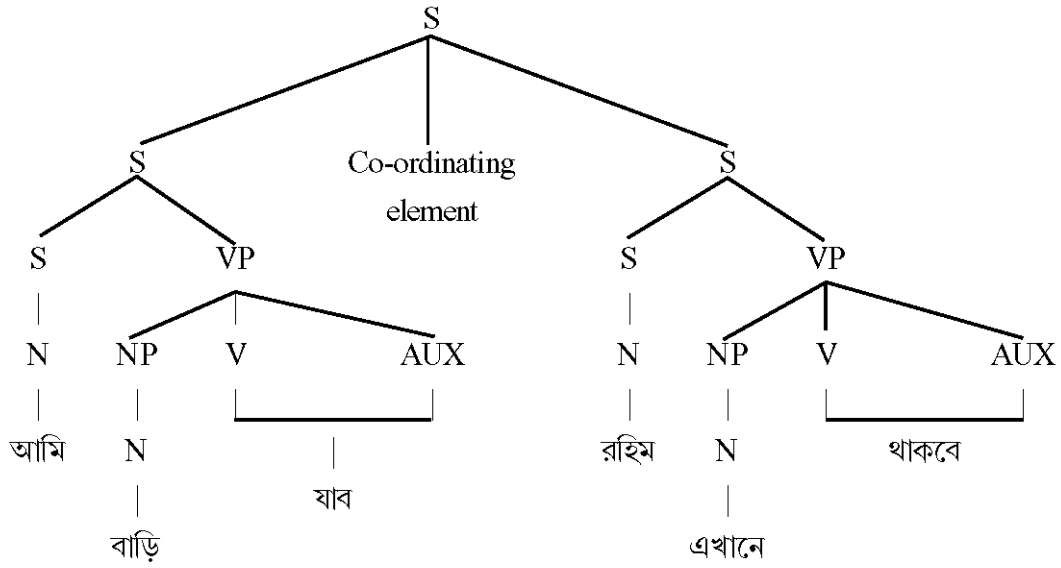

এখানে সংযোগধর্মী উপাদান 'আর' যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও দুটি বাক্য পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। এই একই বাক্য দুটি আশ্রয়মূলক বাক্য হিসেবে কীভাবে সংযোজিত হতে পারে তা দেখানো হল।

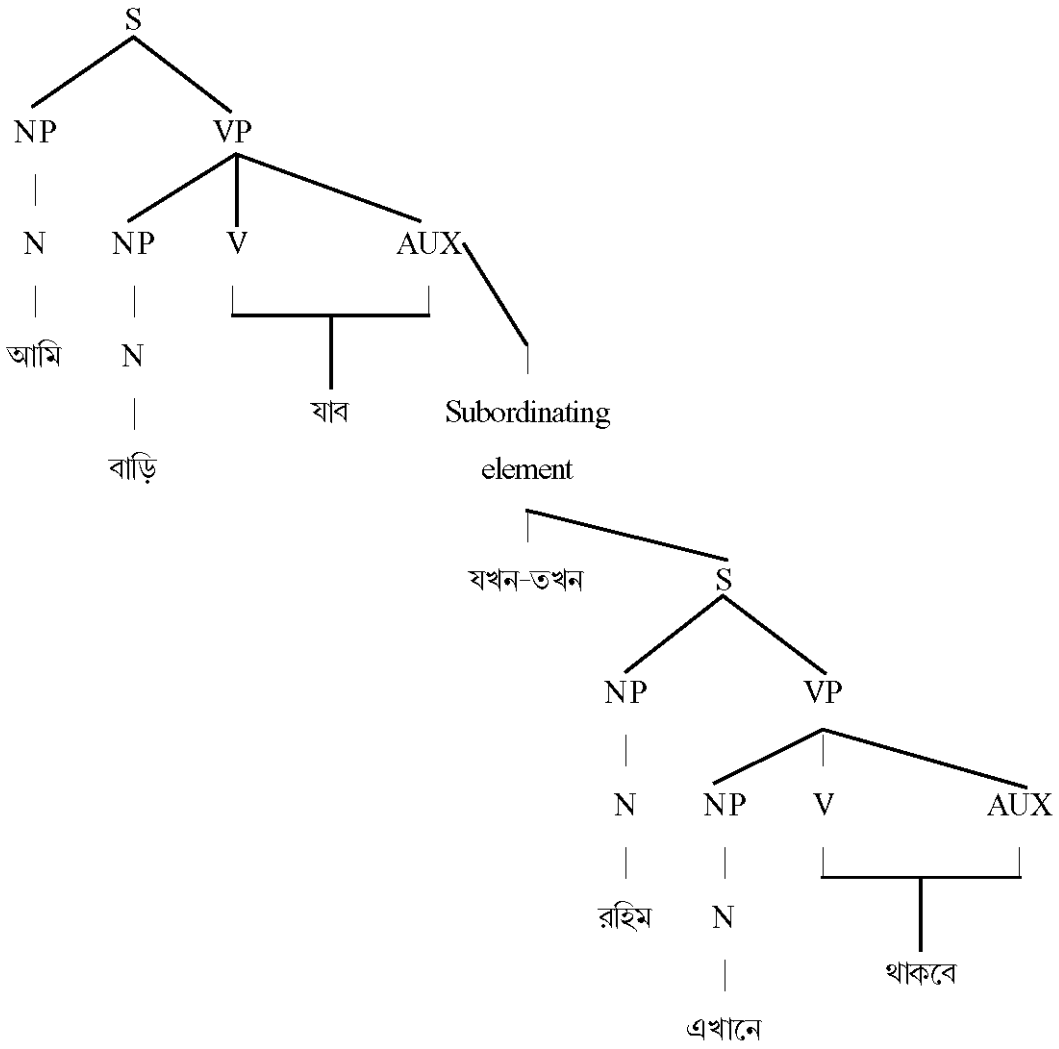

সংযোজিত আশ্রয়মূলক বাক্য—যখন আমি বাড়ি যাব তখন রহিম এখানে থাকবে 'যদি-তবে' দিয়েও এই বাক্য গঠিত হতে পারে। তখন 'যাব' ক্রিয়াপদটি 'যাই' রূপে ব্যবহৃত হবে। 'যদি আমি বাড়ি যাই তবে রহিম এখানে থাকবে।' এই ধরনের সংযোজনের উদাহরণ আরও একটি দেওয়া হল।

বাক্য-১ সে আমাকে বলেছিল।

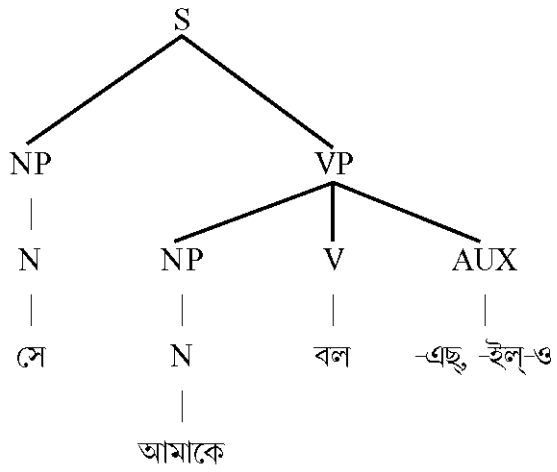

বাক্য-২ তারা আমাকে মারবে।

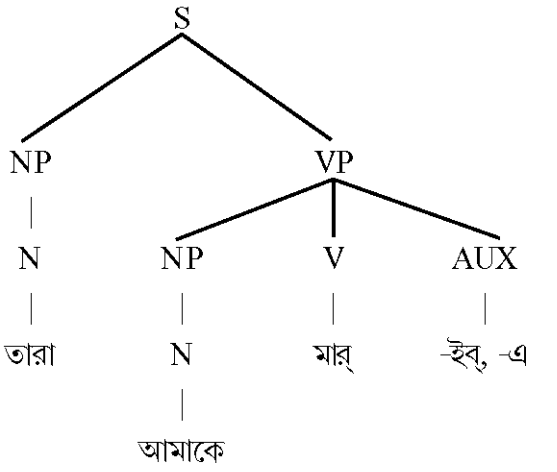

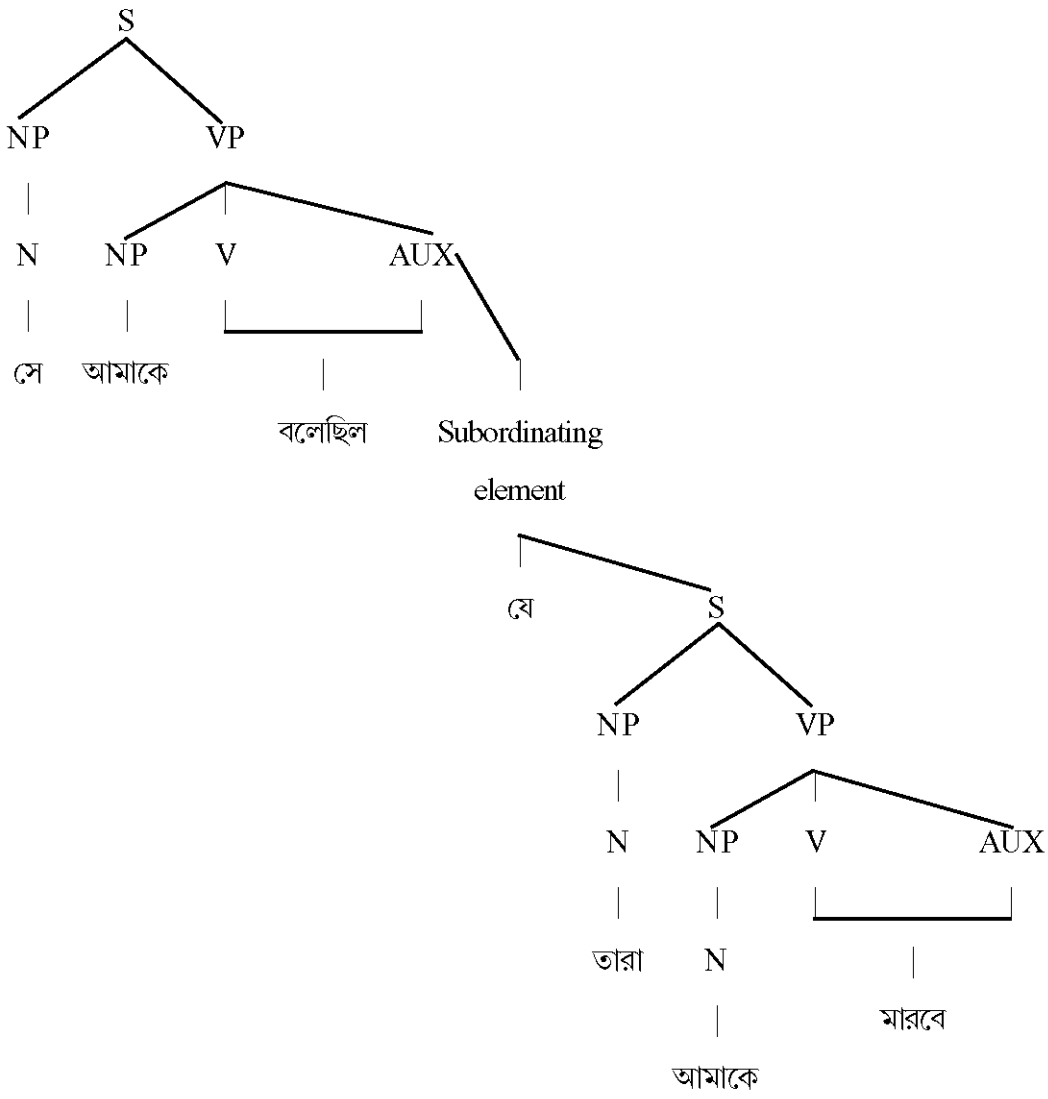

সে আমাকে বলেছিল যে, তারা আমাকে মারবে।

একটি বাক্যের অভ্যন্তরে বা ভিতরে আর একটি বাক্য যুক্ত করাও এক ধরনের বাক্য সংযোজন। একটি বাক্যের অভ্যন্তরে অন্য একটি সাধারণ বাক্য বা বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে নিয়ে আসাকে বাক্য বিগর্ভণ (Sentence Embedding) বলে। যেমন,

১. আমি বইটা তাকে দিলাম।

২. বইটা গতকাল কিনেছিলাম।

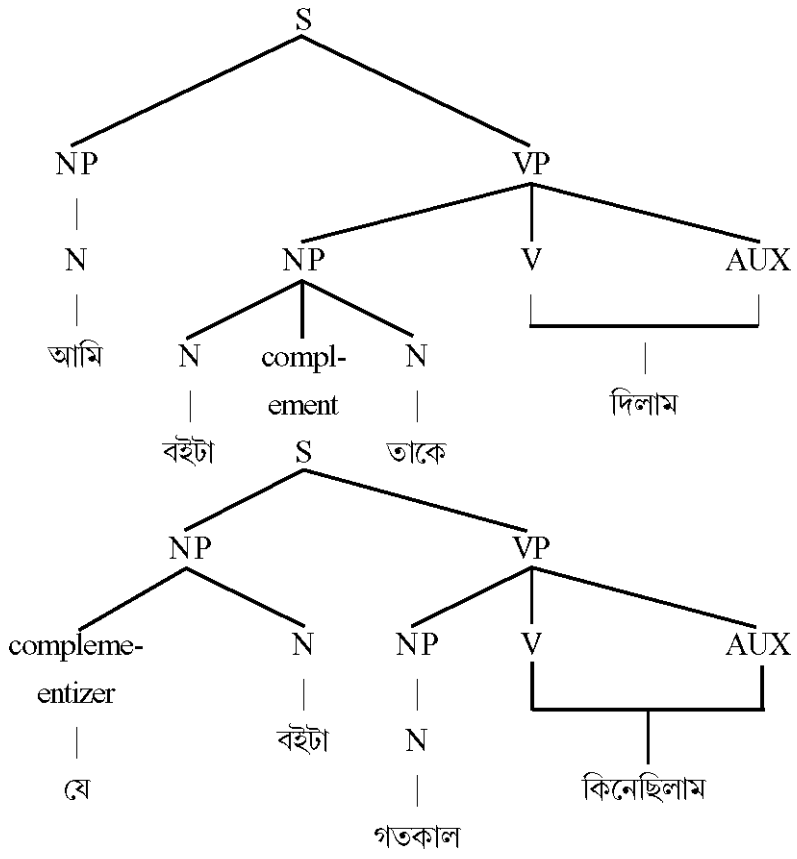
S
NP
VP
N
NP
V
AUX
আমি
N
compl-
N
দিলাম
ement
বইটা
S
তাকে
NP
VP
compleme-
N
NP
V
AUX
entizer
বইটা
N
যে
কিনেছিলাম
গতকাল

১. সে গান গাইছিল।

২. আমি গান শুনছিলাম।

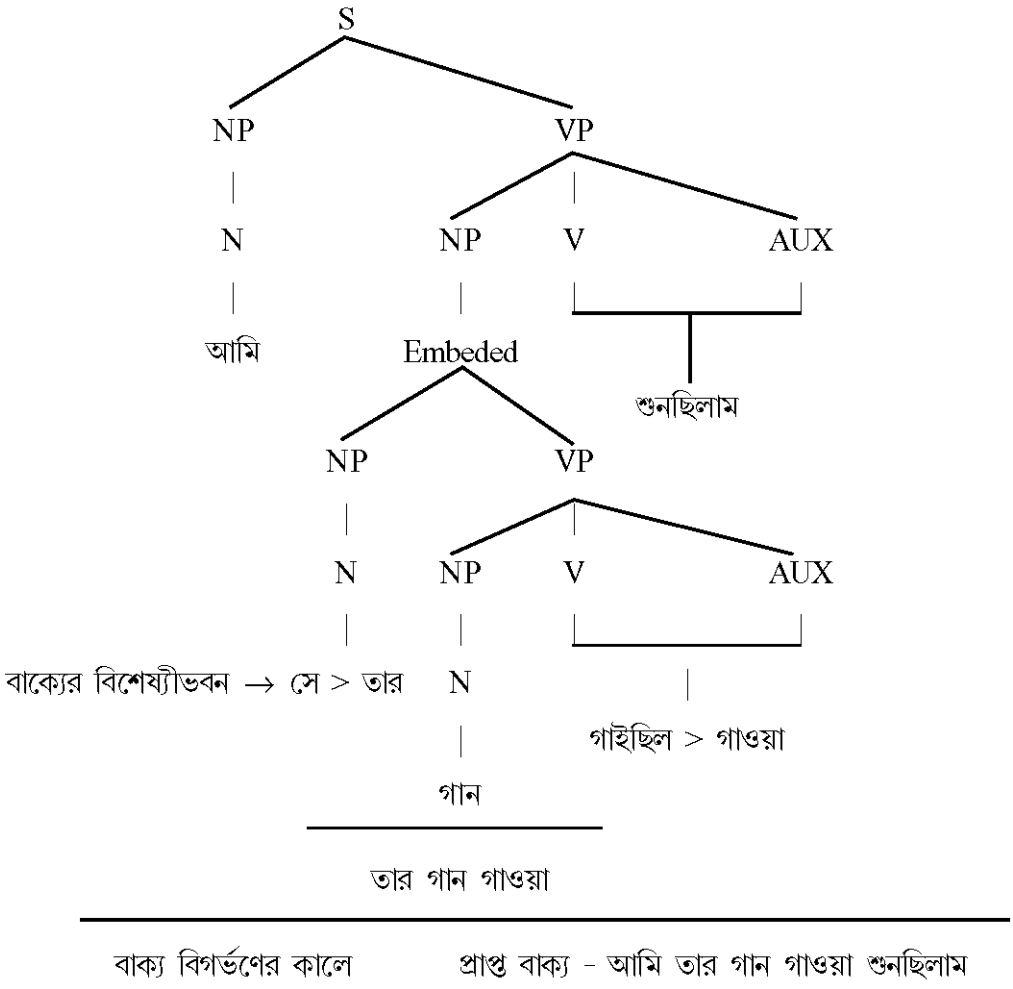

একটি বাক্যকে বিশেষ্যপদে পরিণত করাকে বিশেষ্যীভবন (Nominalization) বলে। ক্রিয়াপদটি এইসব বাক্যে ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয়। ফলে, পুরো বাক্যটিই বিশেষ্য পদে পরিণত হয়। এই ধরনের বিশেষ্যীভূত (Nominalized) বাক্যকে অন্য একটি বাক্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। একটি বাক্যের ভিতরে বিশেষ্যীভূত বাক্য যোগ করাকেও বাক্যবিগর্ভণ বলে।

খ. বিলোপন

যখন বাক্যের কোনও একটি উপাদান লোপ পায় তখন বিলোপন জাতীয় সংবর্তন ঘটে। নানা ধরনের বিলোপন হতে পারে। এখানে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন।

কোনও কিছু আছে বা অবস্থান করছে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় স্থিতিক্রিয়া (Existencial Verb)। অধিকাংশ সময়েই আমাদের কথাবার্তায় এই ক্রিয়াপদকে বাদ দিই। 'ওখানে একটা গাছ আছে' না বলে বলি 'ওখানে একটা গাছ'। 'সামনে গর্ত রয়েছে' না বলে বলি 'সামনে গর্ত ইত্যাদি। এখানে দুটি উদাহরণ দিয়ে কীভাবে স্থিতিক্রিয়া বিলোপিত হচ্ছে তা দেখানো হল।

বাক্য- তোমার সামনে গর্ত।

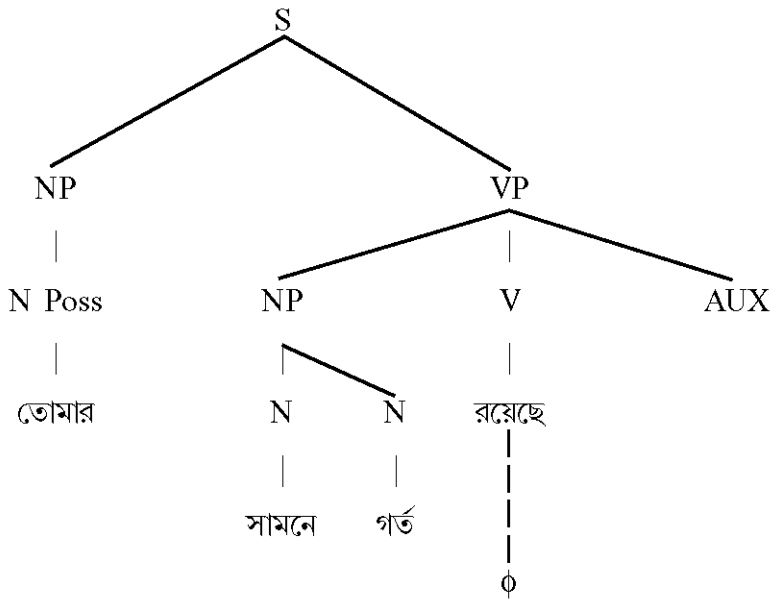

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন

অধিগঠন : তোমার সামনে গর্ত

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন এবং কর্তা বিলোপন।

বাক্য- সামনে বাস।

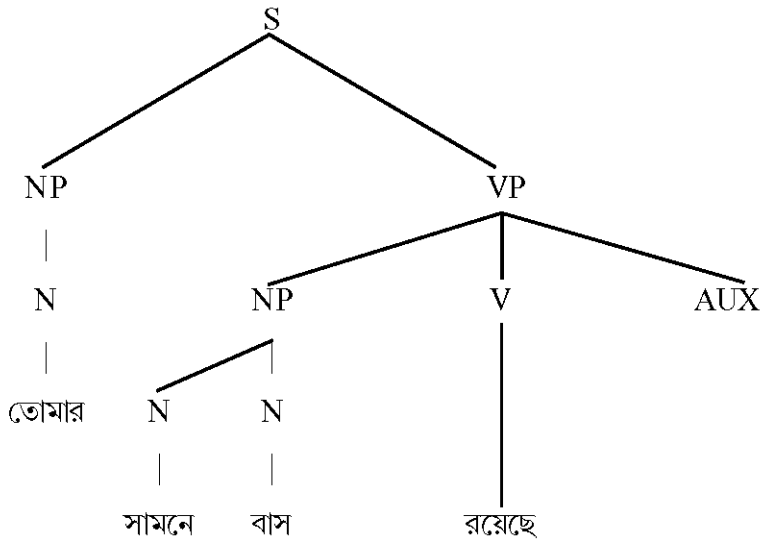

স্থিতিক্রিয়া বিলোপন- ϕ

কর্তা বিলোপন- ϕ

অধিগঠন : তোমার সামনে বাস

এখানে স্থিতিক্রিয়া বিলোপন ছাড়াও আরও একটি বিলোপন দেখানো হয়েছে। সেটি হল—বাক্যের কর্তা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তখন বাক্য বিষয়কে গুরুত্ব দেবার জন্যই কর্তার বিলোপন ঘটানো হয়। এই বিলোপনকে 'কর্তা বিলোপন' (Subject Deletion) বলে।

গ. অধোগঠনে বাক্যের বা আদর্শ বাক্যের দুটি উপাদান পদের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তন করলে অর্থাৎ একটি উপাদানের জায়গায় অন্য উপাদান ও অন্য উপাদানের জায়গায় বদলি উপাদানটি বসলে বিপর্যাস সংবর্তন ঘটে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' এই ধরনের বিপর্যাস সংবর্তন। এখানে উদাহরণ দিয়ে বিপর্যাস সংবর্তন দেখানো হল।

ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন

আমি দেখব না।

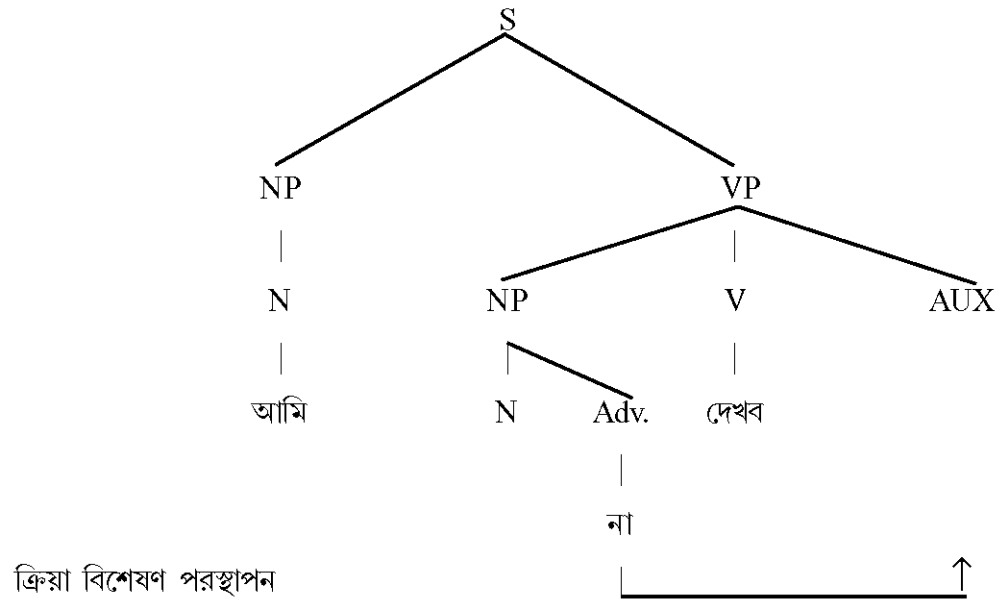

না দেখব > দেখব না

অসমাপিকা ক্রিয়ার আগে ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবে 'না' থাকলে সেক্ষেত্রে 'ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন' সংবর্তন হয় না। যেমন, 'সে না দেখে বলেছে', 'আমি না জেনে বলব না' অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই কেবল ক্রিয়া বিশেষণ পরস্থাপন ঘটে।

তিনি আসবেন না।

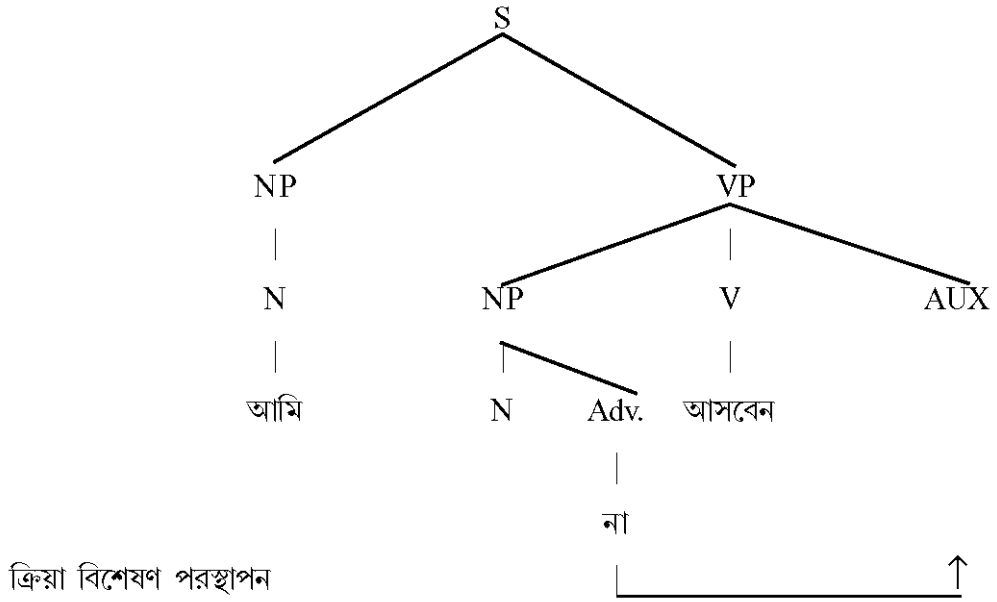

তিনি না আসবেন > তিনি আসবেন না

ঘ. রূপান্তরণ

একটি উপাদানের পরিবর্তে অন্য উপাদান ব্যবহার করাই হল—রূপান্তরণ (Substitution)। 'কলম' না বলে যদি 'পেন' বলি তাহলে তা হল রূপান্তরণ। অনেক সময় পরিভাষা ব্যবহার করলে যদি কেউ বুঝতে না পারে তখন সেটা ঘুরিয়ে ব্যাখ্যা করে বা অন্যভাবে বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও রূপান্তরণ জাতীয় সংবর্তন হয়। বাংলা ভাষায় নানা ধরনের রূপান্তরণ সংবর্তন হয়। যেমন—ক্রিয়াপদ যদি ক্রিয়াবিশেষ্য পদে পরিণত হয় তবে তা এক ধরনের রূপান্তরণ। যেমন, সে খেল > তার খাওয়া। এখানে 'খেল' ক্রিয়াপদ এবং 'খাওয়া' ক্রিয়াবিশেষ্য পদ। নামপদকে সর্বনামপদে রূপান্তরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবর্তন। এখানে সেই ধরনের সংবর্তন দেখানো হল।

তিনি বাড়ি গেলেন।

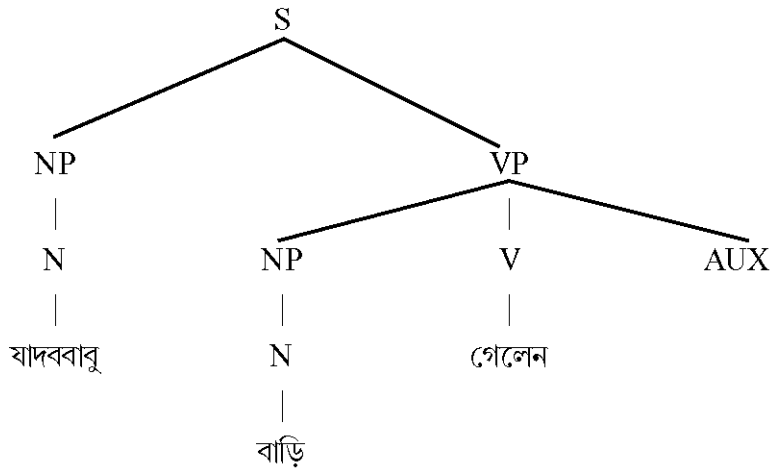

সর্বনামীভবন → তিনি

তিনি বাড়ি গেলেন

জামাল সেখানে গেল।

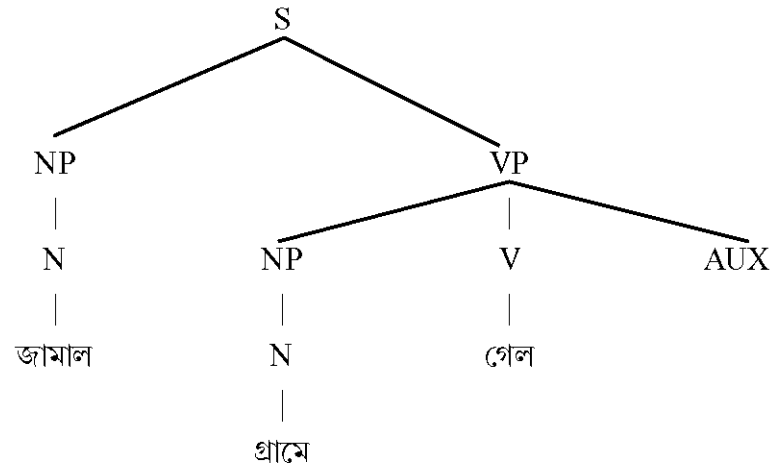

সর্বনামীভবন → সেখানে

জামাল সেখানে গেল

সে ওখানে ছিল।

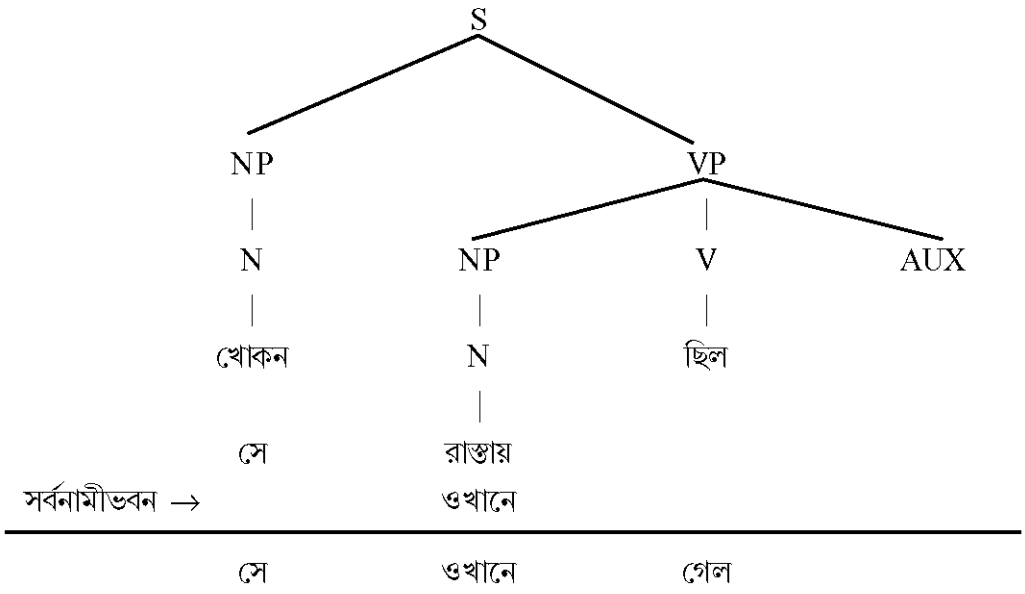

সর্বনামীভবনের ক্ষেত্রে মূল বিশেষ্যপদটি বক্তা-শ্রোতা উভয়ের কাছেই পূর্বপরিচিত থাকে।

৩০২.৪.১৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা ভাষার পদগুচ্ছ সংগঠন নিয়ে আলোচনা করো।

২। বাংলা মৌলিক ও অমৌলিক বাক্যের গঠন সম্পর্কে লেখো।

৩। সংবর্তন কাকে বলে? যে-কোনো দুটি সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৪। সংযোজন কাকে বলে? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৫। বিলোপন জাতীয় সংবর্তন উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

৬। রূপান্তরণ সংবর্তন উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৭। বিপর্যাস ধরনের সংবর্তন নিয়ে আলোচনা করো।

৮। সংক্ষেপে আলোচনা করো—

(ক) মৌলিক বাক্য (খ) আশ্রয়মূলক বাক্য (গ) সংযোগমূলক বাক্য (ঘ) বাক্য বিগর্ভণ (ঙ) বিলোপন (চ) রূপান্তরণ (ছ) বিপর্যাস (জ) স্থিতিক্রিয়া বিলোপন (ঝ) ক্রিয়াবিশেষণ পরস্থাপন (ঞ) সর্বনামীভবন।

৩০২.৪.১৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Noam Chomsky—Aspects of the Theory of Syntax.

২। Noam Chomsky—On Language.

৩। Noam Chomsky—Syntactic Structures.

৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৫। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৬। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

৭। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন।

৮। উদয়কুমার চক্রবর্তী—বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ।

৯। নীলিমা চক্রবর্তী—বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব।

১০। হুমায়ুন আজাদ—বাক্যতত্ত্ব।

NOTES